শ্রী ভূদেব চৌধুরী

রবীন্দ্র উপন্যাস: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে

B
891.443 2
T 326 C

B
891.4432
T 326 C

রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে

শ্রীভূদেব চৌধুরী

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

RABINDRA UPANYAS : ITIHASER PREKSHITE
By SRI BHUDEB CHAUDHURI
Published by Sudhangshusekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Rs.50.00

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ২০০১, শ্রাবণ ১৪০৮
2001

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

Library IIAS, Shimla
B 891.443 2 T 326 C
00113484

Indian Institute of Advanced Study
113484
23.3.04
SHIMLA

দাম : ৫০ টাকা

B
891.4432
T 326 C

ISBN-81-7612-530-X

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে। লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অধ্যাপক সুকুমার সেন
বন্দনীয়েষু

লেখকের অপরাপর গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা প্রথম পর্যায়
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা দ্বিতীয় পর্যায়
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা তৃতীয় পর্যায় [রবীন্দ্রযুগ ১]
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা চতুর্থ পর্যায় [রবীন্দ্র যুগ-২]
বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-কথা
বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার
লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ
বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ ও রামমোহন
দূরের বন্ধু
রবীন্দ্রভাবনা
ছোটগল্পের কথা
কথার ফের ('শান্তিনিকেতন ধারার রবীন্দ্র-নাটক' ও 'বনফুলের গল্প ঃ দেশ-কাল-শিল্প, এবং শিল্পী')—
মানুষ দেখার গল্প

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

দীর্ঘ বছর বাদে "রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে" পুস্তিকাটির পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে। পুনরায় পড়তে গিয়ে মনে হল, সাহিত্য সৃষ্টির রহস্য ইতিহাসের পূর্বাপর প্রেক্ষিতে অনুভব করতে পারার দীন প্রয়াস ছিল এ-রচনার উদ্দেশ্য। সাহিত্য-শিল্পাস্বাদনের এক নূতন দিশা—নূতন মাত্রা! এ প্রচেষ্টার সফলতা যত সামান্যই হোক, প্রকরণগত স্বতন্ত্রতার স্বাক্ষর হিসেবেও এই পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ স্বীকার করতে লোভ হল।

কেবল পুনর্মুদ্রণ নয়, পুরোনো লেখার এটি নতুন সংস্করণও। এই কত বছরের মধ্যে নূতন প্রকাশিত তথ্য-বিস্তারের সংগ্রহ করা গেছে এক জায়গায়। তাছাড়া, নতুন করে পরিমার্জনা করা হয়েছে গোটা রচনাটি। সব মিলিয়ে নতুন প্রজন্মের রবীন্দ্রসাহিত্য-জিজ্ঞাসুতার দরবারে নতুনতর সংবেদন-প্রত্যাশায় সমর্পিত রইল এই নূতন সংস্করণ।

বাকি তথ্য রয়েছে প্রথম সংস্করণের 'প্রসঙ্গ-কথা'য়।

এই উপলক্ষে প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে'র (দে'জ পাবলিশিং) বিদ্যোৎসাহকে সংবর্ধিত করতে হয়।

প্রকাশন-সহায়তায় দাক্ষিণ্য দান করেছেন বোলপুর 'বর্ণপরিচয়' আর বোলপুর 'পুথিঘর'-এর অধিকারিযুগল। তাঁদের নম্র নমস্কার।

ভূদেব চৌধুরী

প্রসঙ্গ-কথা

এ-লেখা ফরমায়েসের ফসল ; আর তার জন্যে ঋণ জমেছে সারস্বত-জননী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবারে। সানুগ্রহ আহ্বান এসেছিল ১৯৮২ সালের দীনেশচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতা দেবার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-পরিবাহিত পরিচয় সন্ধান করে দিন কাটে ; দীনেশচন্দ্রের দিশারি সাধনা এ-পথের পরম পাথেয়। তাঁর পুণ্য-স্মৃতির সঙ্গে নিজের দীন ভাবনাকে যুক্ত করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি।

বিষয়-নির্বাচনেও এ-অনুভব প্রভাব ফেলেছিল। দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। ঐতিহাসিকের সাধনায় কবি উৎসাহিত হয়েছিলেন—তার ফলে সাহিত্য-ইতিহাসের চর্চা নতুন পথের দিশা পেয়েছিল। দীনেশচন্দ্রের এই স্বীকৃতি সম্বল করে বর্তমান রচনারও সূচনা। আর ঐ একই ভাবনাসূত্রে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যায়তন হতে দীনেশচন্দ্রের স্মৃতি অর্চনা করতে যাবার সময়ে রবীন্দ্রনাথকেই আশ্রয় করার লোভ হয়েছিল।

আরো একটা কথা ছিল মনে। সাহিত্যের ইতিহাস কালানুক্রমিক তালিকাতেই নিবন্ধ নয় কেবল ; অবিরল বহমান জীবন-ধারার সঙ্গে আদান-প্রদান, সংযোগ এবং সংঘাতেরও প্রাণদীপ্ত দর্পণ। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক চরিত্রের নির্মীয়মাণ রূপটির পরিচয় সন্ধান করেছি এ-যাবৎ। তাহলেও, বুঝিবা যথেষ্ট সাহসের অভাবেও, সে ধারণাকে স্পষ্ট পরিস্ফুট করা হয় নি প্রথমাবধি। সাহিত্য-ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে সেই অব্যক্ত অনুভবকে এখানে আচরণের মাধ্যমে যথাসাধ্য প্রতিফলিত করা গেল, এই ভাবনাতেও কৃতার্থ বোধ করি।

বক্তৃতার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত লেখায় মুখের কথার আদল এসেছে প্রায়ই ; লৈখিক ভাষার চরিত্র-শৈথিল্য তাতে কতটা ঘটেছে, জানা নেই। কিন্তু বলার অন্তরঙ্গতার সঙ্গে ভাবনার সামান্যতম গাঢ়তাকেও জড়িয়ে দেবার আগ্রহ ছিল আগাগোড়া, অবিরাম।

তথ্য সংগ্রহে ঋণ গ্রহণ করেছি শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে, আর ঋণ দিয়েছেন রবীন্দ্রভবনের শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। সহকর্মী বন্ধু অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু তথ্যের হদিশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া আগাগোড়া উৎসুক সহযোগিতা ছিল ড. গৌরচন্দ্র সাহার তরফ থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি বক্তৃতার বোঝা অপার দাক্ষিণ্যে পরিচালনা করেছিলেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যস্ত তহবিল সমূহের আধিকারিক শ্রীজগদীশ্বর পাল তৎপর সহযোগিতায় ছিলেন অকুণ্ঠ। এ-প্রসঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীর কৃপাপূর্ণ আনুকূল্যও অবিস্মরণীয়। বোলপুর পুস্তকালয়ের সুদক্ষিণ হস্তটিও প্রকাশন-সহায়তায় সর্বদা প্রসারিত হয়ে থাকে। তাছাড়া সহকর্মী শ্রীস্বপনকুমার ঘোষ, আর অধ্যাপক শ্রীমান্ বিশ্বনাথ রায়ও সানন্দে নানা দায়িত্ব পালন করেছেন।

এঁদের সকলকে যথাযোগ্যভাবে নম্র শ্রদ্ধা, আন্তরিক প্রীতি এবং স্নিগ্ধ শুভেচ্ছা সপর্মণ করি।

সবশেষে একটি ব্যক্তিগত নিবেদন। সাহিত্য-ইতিহাস সম্পর্কে প্রথম আগ্রহ এবং বিকাশমান অনুভবের প্রেরণা জেনে-না-জেনে নানা ভাবে আহরণ করেছিলাম অধ্যাপক সুকুমার সেনের অসাধারণ সিদ্ধির রিক্‌থ হতে। সশ্রদ্ধ চিত্তের সেই বিনম্র স্বীকৃতিটুকু নিবেদিত রইল এই দীন প্রয়াসের মুখপত্রে তাঁকে কৃতাঞ্জলি প্রণতি নিবেদনের মাধ্যমে।

ভূদেব চৌধুরী

'অপূরুবা', পূর্বপল্লী,
শান্তিনিকেতন।
৭ই পৌষ, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

সূচিপত্র

প্রাক্‌কথন ঃ —১০-১২

প্রথম অধ্যায় ঃ

করুণা —১৩-১৬

বউঠাকুরানীর হাট —১৬-২১

রাজর্ষি —২১-২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

চোখের বালি —২৬-৩৬

নৌকাডুবি —৩৬-৪২

গোরা —৪২-৫৩

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

চতুরঙ্গ —৫৪-৬৬

ঘরেবাইরে —৬৬-৭৩

যোগাযোগ —৭৩-৮০

শেষের কবিতা —৮০-৮৪

দুইবোন ও মালঞ্চ —৮৪-৮৬

চার অধ্যায় —৮৬-৯২

সংক্ষেপণ সংকেত

১। গ্রন্থ মধ্যে র র অর্থে ''রবীন্দ্র রচনাবলী'' বিশ্বভারতী সংস্করণ বোঝানো হয়েছে। প্রথমোদ্ধৃত সংখ্যাগুলি ''রচনাবলী''র খণ্ডের নির্দেশক।

প্রাক্-কথন

রবীন্দ্রনাথ নাকি দীনেশচন্দ্র সেনকে 'উপদেশ' দিয়েছিলেন[১], "সাহিত্য একটা যুগের প্রতিবিম্বস্বরূপ, সেই যুগের আদর্শ, রুচি ও নীতিজ্ঞান সাময়িক সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়। প্রধান প্রধান লেখকেরা এক এক যুগের কম্পাসের কাঁটার ন্যায় সেই যুগের জাতীয় চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং কোন প্রধান লেখককে ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসা বা নিন্দাবাদ না করিয়া তাঁহার মধ্যে যুগলক্ষণ কি পাওয়া যায়, তাহাই নির্দেশ করা বাঞ্ছনীয়।"

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সাহিত্যরস আস্বাদনের উদ্দেশ্য ও প্রকরণ সম্পর্কে কবি-কথা এখানে স্পষ্ট। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বিশেষ ধরনের আস্বাদন-অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিকতা আরো বেশি।

সাহিত্য আসলে মানুষ নামক 'সামাজিক জীবে'র আন্তরিক আদান-প্রদানের পরিভাষা ; তারও মধ্যে উপন্যাসের শিল্পকলা মানুষের জীবনকে সামাজিক পৃষ্ঠপটে ধরে রেখেই তার সম্পূর্ণ রূপরহস্যকে খুঁজে ফেরে। অন্যপক্ষে মানবজীবনের মূলগত দ্বান্দ্বিক চরিত্রটি সর্বজন-বিদিত—সে দ্বন্দ্বের রকমফেরও অনেক। জন্ম, তথা দেহগত সূত্রে মানুষ 'প্রকৃতির জীব', অন্তঃপ্রেরণার বশে—স্বাধীন মনন ও মনঃপ্রবৃত্তির শক্তিতে—সে 'প্রাকৃতিকতা'র দাসত্ব হতে নিয়তই মুক্তি-পিয়াসি। এ-দ্বন্দ্ব কেবল বাইরের সঙ্গে ভেতরের নয়, প্রায় সবটাই মানুষের অন্তরে ;—নিজেরই মধ্যে ইন্দ্রিয়-প্রয়োজন-বিদ্ধ যে জীবন রয়েছে, তার সঙ্গে লড়াই সতত উত্তরণকামী বোধ-বুদ্ধি-অনুভবের। এ-দুই বিপরীতের মধ্যে সমন্বয়-কামনাতুর মানবমনের উদ্ভাবিত অভিনব বনিয়াদটিকেই আসলে বলি 'সমাজ'। অথচ জোড় মেলাতে গিয়েও জোড় কখনোই মেলে না। মানুষের জীবনে এ-যাবৎ অনপনেয় জটিলতার রহস্য ঐখানে নিহিত—তারই নিরন্তর সন্ধানে শিল্পসাহিত্যের গতি অনিবার। অনেকদিন ধরে, অনেক ভেবেচিন্তে, অনেকের জানা-নাজানা উদ্যমের সূত্রে স্থিতিস্থাপকতার যে-কাঠামোটি গড়ে উঠল, কোনো একটি ব্যক্তিমনের মুহূর্তের বিক্ষেপভরে মূল অবধি তার কেঁপে ওঠে, অতএব আবার জোড় ভেঙে জোড় মেলাবার পালা। এমনি করেই চলে সামাজিক মানুষের ইতিহাস—ব্যক্তিমানুষ আর যূথবদ্ধ মানুষের বিভিন্ন-মুখী আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের অভিঘাত-বিভঙ্গিত বঙ্কিম জীবনের ধারা। একই মানুষের চেতনানিহিত ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত সত্তার সংঘাত-সংযোগে সে-ধারা আরো জটিল ও সংহত হয়ে ওঠে। উপন্যাস জীবন-চরিত্রের এই রূপটিকেই পরিপূর্ণ আকারে গড়ে দেখতে চায় ; তার উৎসার-উৎস তাই সমকালীন সমাজ-ইতিহাসে প্রোথিত হয়েই থাকে।

"নীলদর্পণ" কিংবা "সধবার একাদশী"-তে সমাজজীবনের ছবি যতই জীবন্ত হোক,

---

১। দীনেশচন্দ্র সেন—"ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য" (১৯৬৯)—পৃ. ১৯৭

সাহিত্যরস ততটা নয় ; কারণ ব্যক্তিত্বের অভিঘাত-চঞ্চলতা তাতে অনুপস্থিত। অন্যপক্ষে রসোত্তীর্ণতার প্রয়োজনে নাটককে একান্তভাবে সমাজ-ভিত্তিক না-হলেও চলে—গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যদেহে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর প্রভাবিত জীবনপ্রেরণার আনাগোনা নিরন্তর ; তাহলেও সমকালীন সমাজ-প্রেক্ষিতটি তাতে অনুপস্থিত নয় কেবল, অবান্তরও। কিংবা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমকালীন তরুণমনের অনুভব একেবারেই অযথার্থ যদি না হয়[২],—রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতার মূলেও তাহলে অব্যবহিত ঔপনিবেশিক শাসন-পীড়ার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জড়িয়ে থাকার কথা। অথচ বিশুদ্ধ কবিতারসের আস্বাদনে সে সংবাদ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। সন্দেহ নেই, নাটক কিংবা গীতিকবিতাও সমকালীন যুগজীবন-অভিজ্ঞতায় প্রবুদ্ধ ; তাহলেও সে-জীবনের সঙ্গে বহমান শিল্পলোকের সংলগ্নতা অনিবার্য নয়। অন্যপক্ষে উপন্যাসের বাণীরূপ সমসাময়িক জীবন হতে উৎসারিত হয়ে তারই গহনে বিচরণ করে ফেরে। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের আস্বাদনে ১৭৫৭-পরবর্তী জীবনের পরিচয় না জানলেও চলে, কিন্তু ১৮১৭-র হিন্দুকলেজ এবং ১৮৪৯-এর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় তথা পরবর্তিকালের বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা-উত্তর নাগরিক তরুণ সমাজের চিত্ররূপটি বৃহত্তর ইতিহাসের প্রেক্ষিতে চিনে নিতেই হয়।

অবশ্য সে চেনাজানারও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উপন্যাসে যে-জীবনকে খুঁজি কিংবা জানি, সে কেবল তার বস্তুসম্বদ্ধ চরিত্রে নয়। একতাল মাটি নিয়ে দুজন শিল্পী মূর্তি গড়তে বসলেন ; একজন গড়লেন শিব—আরেকজন বাঁদর। দুজনেরই সৃষ্টির বস্তুগত ভিতটি মাটিই; দুজনের রূপ-রচনাতে জীবনের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত—কিন্তু সে রূপ-রচয়িতার ব্যক্তিমনের অনুভবে রঞ্জিত।

কথাটায় রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন অনবরত ; আইন্‌স্টাইন-এর সঙ্গে তো এ-নিয়ে মতের পার্থক্যই থেকে গেল। বলেছিলেন,[৩] "...এ জগৎ মানুষেরই জগৎ, তার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা আসলে বৈজ্ঞানিক মানুষেরই ধারণা। অতএব আমাদের বাদ দিয়ে এ জগৎ টিকতেই পারে না ; এ এক আপেক্ষিক জগৎ, যা তার বাস্তব বিদ্যমানতার—'রিয়ালিটি'র জন্য আমাদের চেতনার ওপরেই নির্ভরশীল।" "শ্যামলী"র বিখ্যাত 'আমি' কবিতারও সেই কথা ঃ—

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
*　　*　　*
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।"

২। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—"রবিরশ্মি"—পূর্বভাগ (১৯৩৭)—পৃ. ৩৮৩

৩. "...this world is a human world—scientific view of it is the view of the scientific man. Therefore the world apart from us does not exsit ; it is a relative world depending for its reality upon our consciousness."—Cf. 'Authorised version of a conversation between Tagore & Albert Einstien on the nature of reality'—Cf R. N. Tagore—"Religion of Man" [First Ed.] Appendix II, p. 222,

বিজ্ঞানীর সঙ্গে কবির ধারণার বিভেদটা দুর্বোধ্য নয়। আইনস্টাইন স্বভাবতঃই ভাবতে পারতেন, জগতের 'রিয়ালিটি' তার বস্তুগত অস্তিত্বের গহনে নিহিত, বোধবুদ্ধির সহায়তায় মানুষ তাকে কেবলই আবিষ্কার করছে। রবীন্দ্রনাথ ভাবেন, গোলাপের বর্ণ-গন্ধ তার বস্তুসত্তার আঙ্গিক উপকরণ, কিন্তু তার ঐ সুন্দরতার ধারণা তো মানুষের অনুভবের ধন। কিংবা চুনি যে সবুজ নয়, অথবা পান্না নয় রাঙা,—সেও তো মানুষের চেতনারই বিধান বশে।

তেমনি, উপন্যাসের শরীরে ইতিহাস-বাহিত যে-জীবনকে দেখতে পাই, আসলে তা ঐ বৈজ্ঞানিক অস্তিত্বেরই শিল্পি-ভাবিত রূপচিত্র, শিল্পীর চেতনার আলোকে তার বাস্তবিকতার বিশেষিত চরিত্র দীপ্যমান। অতএব উপন্যাসে যুগজীবনকেই কেবল আবিষ্কার করি না, সেই জীবন ঘিরে শিল্পীর সজীব অনুভাবনার প্রতিক্রিয়াকেও আস্বাদন করি।

এই বিশেষ তাৎপর্যে রবীন্দ্র-উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটিকে খুঁটিয়ে দেখার স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। কবিমনের অনন্যসাধারণ সুবেদিতা নিয়তই ছিল একান্ত জীবন-সম্পৃক্ত। নিজের দেশকালবদ্ধ জীবন সম্পর্কে কেবল অনুরাগ নয়, স্পর্শাতুরতাও ছিল তাঁর অমেয় এবং অতন্দ্র। আর ষাট বছরেরও বেশি দীর্ঘ তাঁর সৃজনশীল অভিজ্ঞতায় জীবনের উত্থান-পতনে বন্ধুর তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা ছিল অভাবিতপূর্ণ। ১৮৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্ম, ১৮৬৫-তে লেখা হয়েছিল বাংলা ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক রোমান্স "দুর্গেশনন্দিনী"। আর ১৮৭২-এ "বঙ্গদর্শন"এর পৃষ্ঠায় সমাজ-সমস্যাগর্ভ "বিষবৃক্ষ" যখন অবিরাম প্রকাশিত হয়ে চলেছে, কবির বয়স তখন ১১ বছর, "বিষবৃক্ষ"র তখনই তিনি নিবিষ্টমনা পাঠক। বাংলার নগরজীবনে রেনেসাঁসের প্রাণশক্তি সমন্বয়লোভে তখন জীবন-স্রোতের এপার-ওপার ভাঙাগড়ার খেলায় উত্তাল। আর "চতুরঙ্গ" থেকে "চার অধ্যায়" যখন লেখা হচ্ছে, তখন বিশ শতকীয় সংশয়-চেতনা বাঙালি বুদ্ধিজীবি-জীবনের পায়ের তলার মাটিটুকু ধরেও টান দিয়েছে। কুটিল কঠিন এই যাত্রাপথে কবির সংবেদনশীল মন সন্তর্পণ সচেতনতাভরে সে-জীবনের সঙ্গী হয়েছে, প্রতিমুহূর্তে নিত্যনূতন প্রাণিক প্রতিক্রিয়ার যোজনা করে। বাঙালির জীবন-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বিক্ষেপ-বিভঙ্গিত সেই অধ্যায়টিকে কবিভাবনামন্থিত বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ করার লোভেই এই আলোচনার উৎস। দু-পেয়ে হবে তার চাল :—(১) সময়ের অঙ্ক মেপে জীবনের ঐতিহাসিক রূপটিকে খোঁজা ; আর (২) তারই অভিঘাত-প্রভাবে জেগে-ওঠা কবিমনের চিত্র-চরিত্র। এই দু-য়ে মিলে উপন্যাসের শিল্পপরিণাম—কবির সচেতনতার পত্রপুট ধরে বহমান জীবনের রূপ-রসাস্বাদন। দিশেটি ঠিক হল, এবারে শুরু হতে পারে পথ চলা।

(২)

অঙ্কের হিসেবটাই আগে মেলোনো যাক, ভাবরসের জোড় মেলানো তো চিরকালের দায়। "করুণা" থেকে শুরু করে "চার অধ্যায়" অবধি যদি চলি, তাহলে রবীন্দ্র-উপন্যাসের গোনা-গুনতি সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩। কালাঙ্কিত ভাবনার শৃঙ্খলাসূত্রে এই তেরটি উপন্যাসকে তিনটি অনুক্রমিক ভাগে বিভক্ত করে দেখা চলে :—

(১) প্রস্তুতির পর্যায় :—

"করুণা" ("ভারতী", আশ্বিন ১২৮৪-ভাদ্র ১২৮৫)

"বউঠাকুরানীর হাট" ("ভারতী", কার্তিক ১২৮৮ আশ্বিন ১২৮৯)। প্রথম গ্রন্থন ১২৯০। "রাজর্ষি" [২৬ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত] ("বালক", আষাঢ়-ফাল্গুন ১২৯২)। প্রথম গ্রন্থন ১২৯৩।

(২) স্বাধীন জীবন-সচেতনতার প্রথম পর্যায় :—

"চোখের বালি" ("বঙ্গদর্শন", বৈশাখ ১৩০৮-কার্তিক ১৩০৯)। প্রথম গ্রন্থন ১৩০৯। "নৌকাডুবি" ("বঙ্গদর্শন", বৈশাখ ১৩১০-আষাঢ় ১৩১২)। প্রথম গ্রন্থন ১৩১৩। "গোরা"। ("প্রবাসী", বৈশাখ ১৩১৪-ফাল্গুন ১৩১৬)। প্রথম গ্রন্থন ১৩১৬।

(৩) স্বাধীন-সচেতনতার দ্বিতীয় পর্যায় :—

"চতুরঙ্গ" ("সবুজপত্র", অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩২১) প্রথম গ্রন্থন ১৩২২। "ঘরে-বাইরে" ("সবুজপত্র" বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩২২)। প্রথম গ্রন্থন ১৩২৩। "যোগাযোগ" ("বিচিত্রা", আশ্বিন ১৩৩৪-চৈত্র ১৩৩৫)। প্রথম গ্রন্থন ১৩৩৬। "শেষের কবিতা" ("প্রবাসী", ভাদ্র-চৈত্র ১৩৩৫)। প্রথম গ্রন্থন ১৩৩৬। "দুইবোন" ("বিচিত্রা", অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৩৯)। প্রথম গ্রন্থন ১৩৪০। "মালঞ্চ" ("বিচিত্রা" আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৪০)। প্রথম গ্রন্থন ১৩৪০। "চার অধ্যায়"। প্রথম গ্রন্থন ১৩৪১।

আগেই বলেছি, এই বিভাজনের নিরিখ সময়-চিহ্নিত বিশেষ জীবন-চরিত্রের সঙ্গে কবিভাবনার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুষঙ্গে স্বত-উদ্ভিন্ন। অতঃপর তারই সূত্র ধরে পরবর্তী অনুসন্ধান অগ্রসর হতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম রবীন্দ্র-উপন্যাস "করুণা"র উপন্যাসগুণের গঠন কিংবা পরিণামগত সম্পূর্ণতা সম্পর্কে সংশয় রয়েছে নানা কারণেই। তাকেই পুরোভূমিতে রেখে আলোচ্য পর্বের রচনাধারার কলাকৌশলগত বিশিষ্টতা খুঁজে দেখা যেতে পারে।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে উপন্যাসের শিল্পচরিত্র একান্তভাবেই রেনেসাঁসের ফসল। আর সৃষ্টির প্রাচুর্যে অমেয় হলেও রেনেসাঁসের প্রভাব-পরিধি নিতান্তই সীমাবদ্ধ, একথাও অবিসংবাদিত। মোটামুটি অনায়াস জীবযাত্রার অনুকূল আর্থিক প্রতিশ্রুতিপুষ্ট বুদ্ধিজীবী নাগরিক মন ও মননের অবাধ সমৃদ্ধির সূত্রেই রেনেসাঁসের শক্তি-সামর্থ্যের উৎসার এবং বিকাশ। আক্ষরিক অর্থে তাকে 'পুনর্জাগরণ' বলতে পারি, যদিও 'নবজাগরণ' শব্দটিই বাংলায় ব্যাপক ব্যবহৃত। বস্তুত প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর ইতিহাসেই পুনর্জাগরণের উদ্ভব ঘটে থাকে প্রথম জাগৃতিকালের প্রাণপ্রকৃতির কাঠামোর ওপরে। স্বভাবতই দেশ এবং কাল ভেদে পুনর্জাগরণিক উজ্জীবনের আলম্বন এবং অভিব্যক্তিগত বিভিন্নতা ঘটেই থাকে।

উনিশ শতকে বাঙালি নবজাগরণের মূলে ইতালির (আঃ চতুর্দশ-ষোড়শ শতকারম্ভ) চেয়ে ইংলন্ডের রেনেসাঁস (ষোড়শ-সপ্তদশ শতক)-এর আদর্শের প্রভাব ছিল বেশি। তাহলেও ইংলন্ডের নবজাগরণ প্রধানত আর্থরাজনৈতিক বিমুক্তির প্রেরণা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল—রিচার্ডসনের "পামেলা"তে (১৭৪০) যার ঔপন্যাসিক পরিচয় স্পষ্ট হাতিয়ার-চিহ্নিত। অন্যপক্ষে, বাঙালির নবজাগরণ সমাজ-ধর্মগত বিমুক্তির স্পৃহায় পূর্বাপর উদ্বোধিত। কারণ, মৌল স্বভাবে বাঙালির যূথ-জীবন প্রথমাবধি ছিল সামাজিক-পারিবারিক কাঠামোর ওপরে প্রতিষ্ঠিত। সে জীবনচরিত্রের একদিকে শক্তিসঞ্চার করেছে ধর্মীয় মূল্যবোধ, আর একদিকে স্বভাব-সমর্পী নারীপ্রেম। মধ্যযুগের অনুবাদ-মঙ্গল-বৈষ্ণব কাব্যে তার অভিব্যক্তি অবিরল।

পরবর্তী অবক্ষয়ের শেষে নবজাগরণের মুখ্য হোতারা প্রধানত ধর্মশাস্ত্রসম্মত পন্থায় নারী-ব্যক্তিত্বের সামাজিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজনে ব্রতী হয়েছিলেন। বস্তুত রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মানবিক জীবনমূল্য-সাধনার অন্য কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। সাহিত্যেও নারীব্যক্তিত্বের পুনরুজ্জীবনই মুখ্য প্রেরণা ছিল নবজাগরণের যুগে—মধুসূদনের কাব্যাবলি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পর্যন্ত তার সমর্থন অকুণ্ঠিত। প্রস্তুতি-পর্বে রবীন্দ্র-উপন্যাসের যাত্রারম্ভ বঙ্কিম-পন্থার অনুসরণে, যদিও নিজের পথ খুঁজে পাওয়ায় শিল্পীর স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টি প্রথম থেকেই ছিল স্বভাব-উৎসুক।

"করুণা"র রচনা তথা "ভারতী"র পৃষ্ঠায় মুদ্রণও যখন আরম্ভ হয়েছিল (আশ্বিন-১২৮৪), "বঙ্গদর্শন"-এ "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর প্রকাশ তখনো সম্পূর্ণ হয় নি। "করুণা"র বিষয় সমাজ-সম্পর্কিত। অতএব 'সামাজিক উপন্যাস' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যদি তাকে করা চলে—বঙ্কিম-রচনায় তাহলে তার মুখ্য পূর্বসূরী "বিষবৃক্ষ" (১৮৭৩), "রজনী"

(১৮৭৭)[১], আর "চন্দ্রশেখর"-এ (১৮৭৫) চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপ প্রসঙ্গ। এমন কি "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এরও প্রথমাবধি ছকটা অভিন্ন। বঙ্কিম-উপন্যাসের জীবন-সমস্যা আসলে নবজাগরণ-যুগের নাগরিক সমাজ-মূল হতে উৎসারিত। হিন্দু ও বেথুন কলেজের পড়ুয়া তরুণ-তরুণী সমাজের ব্যক্তিস্বতন্ত্র চিত্ত-জাগরণের প্রথম উৎক্ষেপ-সূত্রে চিরাগত সমাজ-সংস্কারের দ্বন্দ্ব-মন্থন। তাহলেও সেই জ্বলন্ত নাগরিক সমস্যাকে নিয়ে বঙ্কিম পলায়নপর হয়েছিলেন ইতিহাস কিংবা পল্লী-জীবনের আবছায়াতে। "বিষবৃক্ষ", "চন্দ্রশেখর"-এর শৈবলিনী-কথা, এমন কি "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর সমস্যার প্রেক্ষিতে তার পল্লীপ্রচ্ছদ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য নয়, এই অর্থেই বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসগুলিও আসলে সামাজিক রোমান্স ; রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরবর্তী কালে বঙ্কিম-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার বাঙালিত্বের অকৃত্রিমতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন।[২]

"করুণা" রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ষোল বছর। পারিপার্শ্বিক জীবন-সমস্যার সব কয়টি, কিংবা যে-কোনো একটি দিকও কবিভাবনায় তখনই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল, এমন দাবি আতিশয্যদুষ্ট হতেই পারে। অথচ সেই অপরিণত মনের দর্পণেও সমাজ-সমস্যার বিচিত্র চলচ্ছবি অনচ্ছ বাতাবরণে প্রতিফলিত হয়ে ফিরেছে।

প্রথমেই চোখে পড়ে, বাংলা উপন্যাসে রেনেসাঁস-মন্থিত নাগর জীবনচরিত্র "করুণা"র পৃষ্ঠাতেই প্রথমে রূপবদ্ধ হয়েছে। "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে কমলমণির সংসার ছিল কলকাতায়, কিংবা "ইন্দিরা"র উপাখ্যানের মুখ্য অংশ কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত। কিন্তু কলকাতা সে-সব উপন্যাসে অনুপস্থিত। কিংবা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলতা"র মতো উপন্যাসে কলকাতার কালীঘাট তার চিরকেলে চরিত্রে প্রতি-চিত্রিত হলেও, রেনেসাঁসের দ্বৈধ পীড়িত কলকাতার সমস্যাটিকে প্রথমে চিনি "করুণা"র পৃষ্ঠাতেই। নেশাতুর নীতিবিভ্রান্ত মহেন্দ্র আক্ষেপভরে ভেবেছিল, "আমার যদি মনের মতো বিবাহ হইত, গৃহস্থের মতো বিনা দুঃখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পরিতাম, স্ত্রীকে কত ভালোবাসিতাম, সংসারের কত উপকার করিতাম।" অর্থলোভে মহেন্দ্রর পিতা কুৎসিত রজনীর সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দিয়েছিলেন—অথচ "মুখ দেখিলে তাহাকে (রজনীকে) অতিশয় ভালো মানুষ বলিয়া বোধ হয়।" রেনেসাঁসবিদ্ধ বাঙালি যৌবনের অন্তর্দ্বন্দ্বটি ধীরে ধীরে—কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও—মহেন্দ্রর ব্যক্তিত্বে আভাসিত হয়েছে। 'মনের মতো বিবাহ' থেকে বঞ্চিত, অর্থগৃধ্নু পিতার প্রতি সহজ শ্রদ্ধার অভাব, হতাশ বিক্ষোভে আত্মমর্ষণের ব্যাকুলতা, মদ্যাসক্তির নিকট ক্রমিক আত্মসমর্পণ, উচ্ছৃঙ্খলতার প্রলোভন এবং সব কিছু নিয়ে নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্ব-পরিণামী আত্মোদ্ধার—এ-সবকিছুই রেনেসাঁস-সূচনার মর্মমন্থনের ইতিহাস।

এই প্রসঙ্গে বিধবা মোহিনীর ভূমিকাটি বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেয়,—কিংবা পরবর্তী বিনোদিনী-ভাবনার এ-বুঝি পূর্বচ্ছায়া! পুকুর ঘাটে মোহিনীর যাতায়াতের সংঘট্টও সেকালের কাশীপুর-কলকাতার প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত ; বারুণি পুষ্করিণী হতে তার তফাত কেবল স্থানগত নয়—গুণগতও। নরেন্দ্রর শহুরে মোসাহেবেরা যে সেকালের শহুরে জীবনেরই ফসল, "একেই কি বলে সভ্যতা", "সধবার একাদশী" কিংবা

১। "বঙ্গদর্শন"। প্রকাশকাল ১২৮১-১২৮২।
২। দ্র. "ছিন্নপত্র"—পত্রসংখ্যা ৫—পৃ. ১৬

অনুরূপ অজস্র সমকালীন সামাজিক প্রহসনে তার পরিচয় দ্বিধাহীন। সমসাময়িক গ্রামীণ জীবনচরিত্রের রূপরেখাও অস্বচ্ছ থাকে নি ঐ কাঁচা মনের ভাবনাতেও। জমিদারের একমাত্র মেয়ে করুণা ; নরেন্দ্র তো ঘরজামাই! তবু অনুপের মৃত্যু শেষে করুণার ওপরে অমানুষিক নির্যাতন, নরেন্দ্রর উচ্ছৃঙ্খলতা ও করুণার প্রতি অত্যাচার, ব্যভিচারে সম্পত্তিনাশ, এবং আরো অনেক কিছুই—এ-সব ঘটল কি করে? ঔপন্যাসিক সে-কথার স্পষ্ট জবাব দেন নি ; সমস্যার সংগঠন ও সংহতি বিধানের শৈল্পিক সামর্থ্যও ঐ বয়সে গড়ে উঠবার কথা নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা কিছু মনে জাগে ঃ—(১) পিতৃসম্পত্তিতে কন্যার দায়াধিকারের অভাব, (২) যথোচিত শিক্ষায় বঞ্চিত থাকার দরুন নারীব্যক্তিত্বের স্বয়ংভর হয়ে ওঠার অসামর্থ্য, (৩) অন্ধসংস্কারবশে সতীত্বকে স্বামীর দাসীত্বের একান্ত সমার্থক বিবেচনা, (৪) সব কিছু মিলে অপরিণতমনস্কা নারীর আত্যন্তিক অসহায়তা ঐ ভঙ্গুর সমাজ-কাঠামোর অস্তিত্বের সংগতি নিয়েই প্রশ্ন তোলে। তারই বিপরীত কোটিতে রয়েছে বৃদ্ধ সার্বভৌম পণ্ডিতের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের কটাক্ষপূর্ণ বিবরণ, পুরুষপ্রাধান্যলাঞ্ছিত একই সামাজিক অবক্ষয়ের উল্টো পিঠটিকে যা প্রকট করে তোলে।

আর এই সব কিছুর গভীরে শিল্পীর আপন মনের গড়া বুনোটটুকুও দুর্লক্ষ্য নয়। নরেন্দ্র বাড়ি আসছে না, 'বাড়ির পুরাতন চাকরানি' ভবিকে জিজ্ঞেস করে-করেও উত্তর মেলে না, অতএব, "করুণা অতিশয় বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল ও প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি মঙ্গলবারের মধ্যে নরেন্দ্র না আসেন তবে তাহার যতগুলি পুতুল আছে সব জলে ফেলিয়া দিবে।" বালিকাবধূর নিরুপায় অভিমানের কৌতুককরতাই নয় কেবল, মর্মান্তিকতাও এই আপাতলঘু রসায়নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে ; "মানসী" কাব্যের 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায় যার স্ফুটতর অভিব্যক্তি। এর পরে নরেন্দ্রর পদাঘাতে যখন আপন পিতৃগৃহে করুণা মূর্ছিত হয়ে পড়ে, কিংবা তারও পরে, নিজের গৃহাশ্রয়টুকু হতে যখন সে বিতাড়িত হয়, তখনই ঐ 'বুদ্ধিবিহীনা' বালিকাবধূর বিড়ম্বনাটি স্পষ্ট গোচর হয়ে ওঠে। একান্ত পুরুষবিলগ্ন নারীজীবনের এই ট্রাজেডি কেবল করুণার নয়,—করুণা, রজনী, সার্বভৌমের পদস্খলিতা দ্বিতীয়া পত্নী, সবাই এখানে সগোত্র। এরপর "চোখের বালি"র আশা-তে রজনীরই পরিণততর আভিব্যক্তি অনুভূত হলে সংশয়ের কারণ অল্পই থাকে।

আরও একটা কথা, রবীন্দ্র-ছোটগল্পের প্রথম পর্যায় মুখ্যত গ্রামজীবন-ভিত্তিক ; তাঁর উপন্যাস—সামাজিক উপন্যাস—প্রথমাবধি নগরকেন্দ্রিক। আগেও বলেছি, রেনেসাঁস-জীবনগ্রন্থির কেন্দ্রোদ্ভূত উপন্যাস-কলা নাগর নবজাগরণেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত। কিন্তু অঙ্কুরোপম এই প্রথম উপন্যাস হতেই গ্রাম-নগরে সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত বাঙালির দু-ভাগ হয়ে-যাওয়া জীবনস্রোতকে সন্নিহিত, এবং শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত-সংহত করে সামগ্রিক জাতীয় জীবন-চরিত্রটিকে প্রত্যক্ষ করে তোলার প্রয়াস অনুভবযোগ্য হয়ে উঠেছে। বাঙালির রেনেসাঁস বিশেষভাবে ঔপনিবেশিকতাক্রান্ত নাগরিক মধ্যবিত্ত মনঃপীড়ার ফসল ; সেই কারণেও তার আবেদন বৃহত্তর জীবনমূল হতে প্রথমাবধি একান্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। বাংলাদেশের জীবন গ্রামধৃত—গ্রামলালিত ; ঔপনিবেশিক শহর—শহরশ্রেষ্ঠ কলকাতাও—তার মধ্যে জেগে উঠেছিল নিঃসঙ্গ ব-দ্বীপের মতো। উপন্যাসকে বলা হয় 'আধুনিক যুগের মহাকাব্য'। আধুনিকতার অন্তর্বিরোধ—তার 'ডায়ালেক্‌টিক্স'-এর বহিরুপাদান বাংলাদেশে মূলত গ্রাম-শহরে ছড়ানো জীবনের স্বতোবিচ্ছিন্নতা ও স্ব-বিরোধের তাড়নায় উন্মোচিত।

বেজোড়ে জোড় মিলিয়ে দেবার আন্তরিক আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনার মৌল প্রবণতা ; আমাদের কালের জাতীয় চিন্তকদের প্রধান সমস্যাও হয়েছে আজ তাই। বঙ্কিমের কালের উপন্যাসে শহুরে আদর্শ-সংঘাত বনাম গ্রামীণ জীবন-চিত্রণের বিরোধী দাবির মুখেই "বিষবৃক্ষ"-"কৃষ্ণকান্তের উইল" বনাম "স্বর্ণলতা"র প্রতিযোগিতা প্রখর হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথই তার মধ্যে সমসাময়িক জীবন-সমস্যার পুরো চক্রাবর্তটিকে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করলেন—মধুসূদনের দুটি লঘুনাটক জুড়ে যে পূর্ণবৃত্তের রূপরেখা প্রথম আভাসিত। রেনেসাঁস-বিচ্ছিন্ন বাঙালি জীবনকে তার পূর্ণায়ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে অবধারণের এই অন্তর্দৃষ্টি রবীন্দ্র-উপন্যাসেরই দান বাংলা সাহিত্যে—"করুণা"র অপরিণতির মধ্যেও তার হাতিয়ার-চিহ্নটি পরিস্ফুট।

আর আগে বলেছি, জীবনের ইতিহাস তার বস্তুরূপের মধ্যেই একান্তবদ্ধ হয়ে নেই,—দ্রষ্টা এবং বোদ্ধার চেতনার রঙে তা অনুরঞ্জিত। রবীন্দ্র-মনের রঙটুকুর আভাও ঐ প্রথম উপন্যাসে চোখে পড়ে ঘুরেফিরে—মহেন্দ্র-মোহিনীর পরিণামে ; মহেন্দ্রর আত্মমন্থন ও উত্তরণ, মোহিনীর আত্মসংহরণ, রেনেসাঁস-জীবনের উদয়াচল-লগ্নে ট্রাজেডির রক্তিম আতঙ্ককে মানবিক প্রত্যাশার অরুণরাগে রঞ্জিত করতে চেয়েছে ; বঙ্কিম-উপন্যাস যে-সমস্যায় জর্জরিত,—"কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর 'পরিশিষ্ট'-তে যার স্বাক্ষর গাঢ়তম।[৩] আসলে অনুচ্চারিত হলেও সেই ঊষাকাল হতেই কবি-প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অবিচলিত—"মানুষের শক্তিকে অবিশ্বাস করা" তাঁর পক্ষে সর্বদাই ছিল অসম্ভব।

সবকিছু মিলে, শিল্প-পরিণতির অস্ফুটতা সত্ত্বেও, "করুণা"র অতিনাটকীয়তা-খচিত বিবরণাত্মক কাহিনী-ধারায় ষোল বছরের রবীন্দ্রনাথের প্রেক্ষিত-চেতনার স্বচ্ছতা এবং অভিনবতাটুকু শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করতে পেরেছে।

"বউঠাকুরানীর হাট"-এর রচনা (১২৮৮-৮৯) রবীন্দ্র-ভাবনায় কালান্তরের আভাস-চিহ্নিত। সময়ের হিসেবে "করুণা"র তুলনায় "বউঠাকুরানীর হাট" চার বছরের ছোট—কিন্তু কবিমনোভাবের বিবর্তন-ধারায় সে এক স্বতন্ত্র পর্যায় ; কবি-কথাতেও তার ইঙ্গিত রয়েছে। "করুণা" সকল দিক থেকেই অপরিণত মনের ফসল—কবিতায় তখন "বনফুল"-এর কাল চলেছে। অন্য পক্ষে "বউঠাকুরানীর হাট" "সন্ধ্যাসংগীত"-ভাবনার সহযাত্রী ; কাব্যটি উপন্যাসের আগেই গ্রন্থিত হয়ে গিয়েছিল। "সন্ধ্যাসংগীত"-এ অস্ফুট-অপরিণত হলেও রবীন্দ্র-কবি-ভাবনার প্রথম স্বাধীন-স্বতন্ত্র প্রকাশ ; কবি নিজেও এ-কথা পুনঃপুন ঘোষণা করেছেন। "বউঠাকুরানীর হাট" সেই বিকচ আত্মপ্রত্যয়ী মনের কথা-রচনা ; "সন্ধ্যাসংগীত"-ভাবুকতারই মতো নূতনতর পথ-চলার উন্মুখ আগ্রহে স্বাক্ষরিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,[৪] 'অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন' গিয়ে প্রবেশ করেছিল ; যেন কবির 'লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে।' আসলে এ-ও 'ছেলেমানুষি' মনের 'খেয়াল'-'খেলা', তাহলেও 'তার থেকে প্রাথমিক মনের একটা কারিগরি বেরিয়ে' পড়েইছে। কবিমনোধর্মের এই প্রেক্ষিতেই রচনাটির যা-কিছু

৩। বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য দ্র. ভূদেব চৌধুরী—"বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা" ২য় পর্যায় (ষষ্ঠ সং) —পৃ. ৩৬৪

৪। দ্র. "বউঠাকুরানীর হাট"-'সূচনা'—র. র. ১

স্বাদ-মূল্য,—এ-ইঙ্গিতও রবীন্দ্রনাথেরই।

"সন্ধ্যাসঙ্গীত" আসলে বয়ঃসন্ধি-পীড়িত অন্তর্বদ্ধ মনের প্রথম মুক্তিবাসনায় আলোড়িত। বয়ঃসন্ধির সেই পরনির্ভর-কামনা "বউঠাকুরানীর হাট"-এরও মর্মলীন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরেই এগোতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—তাই প্রচ্ছদটা ঐতিহাসিক উপন্যাসের। কিন্তু যে-ইতিহাস অতীত তথ্যের সীমাবন্দী তার প্রতি রবীন্দ্র-মনের আগ্রহ সামান্যই ছিল। তাঁর সৃজনীভাবনার অবিচল আসনটি পাতা হয়েছিল ইতিহাসের নির্মাণশালায় ; চোখে-দেখা বহমান জীবনের স্রোতে-অভিঘাতে ভাবী কালের ইতিহাস যেখানে নিরন্তর প্রস্তুত হয়ে চলেছে—যে ইতিহাস প্রতিমুহূর্তে সৃষ্টি করছে মানুষ নিজে—তার ব্যক্তিরূপে এবং নিত্য-কালীন স্বরূপেও। "বউঠাকুরানীর হাট"-এর 'খেলা'ও তাই নিয়ে[৫], 'একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলা'।—রোমান্স-এর প্রয়োজন ছিল, কারণ অভিজ্ঞতার কঠিন মাটিতে শিল্পীর ভাবনার সহজ-বসতি তখনো প্রস্তুত হয় নি। আর রোমান্সের বাহন হিসেবে ইতিহাস-কথার জুড়িগাড়িটি বঙ্কিমের হাতেই নিটোল গড়া হয়ে গিয়েছিল। সেই গাড়িটি ধার করলেন রবীন্দ্রনাথ, আর পথের চৌহদ্দির নিশানা দিয়েছিলেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—বঙ্কিমের ঐতিহাসিক রোমান্সের প্রতিস্পর্ধিতাভরে পুরো দুটি খণ্ড জুড়ে যিনি 'যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস' লিখতে চেয়েছিলেন,—"বঙ্গাধিপ পরাজয়"-এ (১৮৬৯, ১৮৮৪)। উপন্যাস যেমনই হোক, ইতিহাসের খসড়া পুরো ঐখান থেকে পেয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

স্বতন্ত্রভাবে 'ইতিহাস থেকে' 'তথ্য সংগ্রহ' করতে পারার দাবিও তিনি তুলেছেন।[৬] ইতিহাস পাঠে আলস্য তাঁর মোটেই ছিল না, কিন্তু নিয়মিত 'তথ্য সংগ্রহ', আর সৃজনক্ষেত্রে তার প্রয়োগের ব্যাপারে সহজ-প্রবণতাও যে যথেষ্ট ছিল, এমন দাবিও হয়ত যুক্তিযুক্ত হবে না। বর্তমান প্রসঙ্গে নিজে কতটা তথ্য ঘেঁটেছিলেন, তারও পুরো হিসেব পাবার উপায় নেই। তাহলেও, ১২৮৮-তে "বউঠাকুরানীর হাট" "ভারতীতে" প্রকাশিত হতে আরম্ভ করার আগে ১২৮৭-র "ভারতী" পত্রিকায় কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস'—বিষয়ে যে প্রবন্ধটি লেখেন, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় সেটি পড়েছিলেন। তাতে, 'বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র ও ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের লেখা' দুটি রচনার উল্লেখ আছে।[৭] মনে হয়, পুরাতন এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত জেমস ওয়াইজ-এর প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করে পড়েছিলেন।[৮] 'ইতিহাস থেকে' 'তথ্য সংগ্রহ'-র দিশা ওইখানে নিহিত থাকতেও পারে। তাছাড়া ব্রজসুন্দর মিত্রর "চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ"র কথাও মনে আসতে পারে।

বাংলাদেশের বারো ভুইঞার মধ্যে সবসুদ্ধ পাঁচ জন সম্পর্কে প্রাথমিক সমীক্ষা রয়েছে ওয়াইজ-এর লেখায় ; এবং প্রতাপাদিত্যের প্রসঙ্গ তাতে একেবারেই নেই। কিন্তু আছে চন্দ্রদ্বীপ-এর ভুইঞা রামচন্দ্র রায় আর তাঁর পিতা ও পূর্বপুরুষের বিবরণ। রামচন্দ্র সম্পর্কে

৫। দ্র. তদেব।

৬। দ্র. "বউঠাকুরানীর হাট"-'সূচনা' পূর্বোক্ত।

৭। দ্র. প্রশান্তকুমার পাল—"রবিজীবনী" দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪২

৮। দ্র. James Wise–'On the Barah Bhuiyas of Eastern Bengal'–"Journal of the Asiatic Society of Bengal," Vol. XLIII-Part I (History and Literature etc) No I-IV, 1874.

জানানো হয়েছে—তিনি প্রতাপাদিত্যর 'একটি কন্যা'কে বিবাহ করেছিলেন, এবং বিয়ের দিনেই 'রমাই বীর' ভাঁড় ঘটিত দুর্ঘটনাটি ঘটে। ক্রুদ্ধ প্রতাপাদিত্য জামাতাকে সেই রাত্রেই হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নববধূর আনুকূল্যে রামচন্দ্র পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন; নদীগর্ভে প্রতাপাদিত্যের পেতে-রাখা বাধাগুলো ডিঙিয়ে নৌকো পার করে দিয়েছিল দুর্ধর্ষ পরিকর রামমোহন মাল। ইতিহাসের অনুমান,[৯] সম্ভবত প্রতাপাদিত্যের তিরোধানের পরেই, তাঁর মেয়ে স্বামীর ঘরে ফিরতে পেরেছিলেন বহুদিন বাদে। চন্দ্রদ্বীপে পৌঁছে (রাজধানী মাধবপাশা) প্রতাপাদিত্য-কন্যা যে-ঘাটে নৌকো বেঁধে স্বামীর কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন প্রত্যাবর্তনের অনুমতি চেয়ে—পরবর্তী কালে সেইখানে একটি হাট গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক বলেছিলেন[১০] 'এখনো তা বধূঠাকুরানীর হাট নামে অভিহিত।'

কবি-কল্পনার সুরটি বাঁধা হয়ে গিয়েছিল ঐ তারে। "বউঠাকুরানীর হাট"-এর মূল ঘটনা প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস নিয়ে গড়া, উদয়াদিত্যর জীবন ঘিরে তাঁর শিল্পাবেদন মুখরিত,—বিভা-কাহিনী তার একটি উপপ্রসঙ্গ, সুরমার মৃত্যুর পরে যা বসন্তরায়-প্রসঙ্গের চেয়েও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তাহলেও "বউঠাকুরানীর হাট" এই উপন্যাসের নাম; সে-নামের সংগতি ঘোষণা করেই এ-উপন্যাসের সমাপ্তি! অথচ, তাতেও গল্পের জোড় মেলে না। ইতিহাসের খবর :—প্রতাপাদিত্য-কন্যা স্বামী রামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিলেন; রাজারানীর সম্মিলনের স্মারক হিসেবে "বউঠাকুরানীর হাট"-এর পত্তন স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু যে-রানী, উপন্যাস অনুসারে, রানী হবার আগেই প্রকাশ্য সভায় রাজার কাছে প্রত্যাখ্যাতা, তাঁর নামে হাট স্থাপন করেছিল কারা? রামমোহন ছাড়া আর কারো মনের ঘরে তাঁর কোনো স্থানই ছিল না—সে রামমোহনও উপন্যাস-কথানুসারে বিভার সঙ্গেই রাজ্য ছেড়ে গিয়েছিল। আর এমন ঘটনায় রাজরোষের সম্ভাবনাও তো ছিল।

আসলে "সন্ধ্যাসংগীত"-এর নিরুদ্দেশপ্রেম-ব্যথাতুর কবিমন ইতিহাস হতে সেদিন ঐ নামের ভেতরকার রোমান্টিক ভাব-সুরভিটুকু আহরণ করেই তন্ময় হয়েছিল। তার আগেই তার জানা হয়ে গেছে[১১]—"মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।"—"সন্ধ্যাসংগীত"-এ সেই মানুষের সঙ্গহারা মনেরই আকুল আক্ষেপ[১২],—"আর কিছু নয়। নিরালয় এ হৃদয়। শুধু এক সহচর চায়।" সেই সহচর চাওয়া, চেয়ে না-পাওয়া এবং পেয়ে হারানোর অরূপ অপরূপ ব্যথাতুরতাকেই কবি ছড়িয়ে দিয়েছেন বিচিত্র-চরিত্র মানুষের ব্যক্তিত্বের গভীরে। তাঁরই কথায় মানুষের চরিত্র নিয়ে খেলাই এ উপন্যাসের একমাত্র বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সে-খেলা নিছক 'ছেলেমানুষি' নয়, শিল্প-খেলাও।

আর তাই ইতিহাসের সঙ্গে গল্পের যোগ সামান্যই। প্রতাপাদিত্যর জীবন যেমনই হোক, উপন্যাসে চিত্রিত চরিত্র ইতিহাসের বিশ্বাসকে অন্তত আভাসে ধরেছে[১৩]; "...তিনি কোন যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং বাঙালী জমিদারদের বিরুদ্ধে মুঘল সুবাদারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথ, তাছাড়াও, তাঁকে মদান্ধ এবং

৯। দ্র. তদেব—পৃ. ২০৮
১০। তদেব—পৃ. ২০৮
১১। "কবিকাহিনী"—র. র. (অ. সং ১)—পৃ. ১৪
১২। 'দুঃখ-আবাহন'—"সন্ধ্যাসংগীত"—র. র. ১—পৃ. ১৭
১৩। রমেশচন্দ্র-মজুমদার (সঃ)—"বাংলাদেশের ইতিহাস" মধ্যযুগ—পৃ. ২০৭

হঠকারী রূপেও চিত্রিত করেছেন। সেদিনের রবীন্দ্র-মনোভাবনার পরিভাষায় যদি বলি, প্রতাপাদিত্য ছিলেন মূর্তিমান 'অপ্রেমী'!

আসলে এই কারণেই প্রতাপাদিত্য-কথা মূল গল্পের কেবল প্রেক্ষাপট রচনা করেছে ; আসল গল্প তো উদয়াদিত্যের—রবীন্দ্র-স্বপ্নের পরিভাষায় যাকে বলতে পারি—প্রেমিক, প্রেমবঞ্চিত ; আরো যদি বলি "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এর অন্তর্বিদ্ধ কবিমনের রূপরেখাটি! সেই ব্যথাই উপচে পড়েছে বিভার অন্তিম প্রেমবঞ্চনায়—নামকরণে যার আভাস।

উদয়াদিত্য এ-দিক হতে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক ; রামচন্দ্র-বিভা-কথা ইতিহাসের বিপরীত ; কিংবা বসন্ত রায় বৈষ্ণব পদকর্তার ভাব-বিভূতিঘেরা কবির মনোমাধুরি-সার। সুরমা-উদয়াদিত্য প্রসঙ্গ ইতিহাসে না-থাকতেও পারে,[১৪] এবং তার পরিকল্পনায় শিল্পীর স্বাধীনতার অধিকার অশেষ না হলেও অবশ্যস্বীকার্য। অথচ উদয়াদিত্য প্রেমিক হোন, না-হোন, সাহসী সমর্থ যোদ্ধা তিনি ছিলেনই, এবং যুদ্ধে পিতার অনুবর্তিতাই করেছিলেন—এ সিদ্ধান্ত ইতিহাস-এর[১৫]। অন্যপক্ষে রামচন্দ্ররায়-বিভার সম্পর্কের ইতিহাস-স্বীকৃত পরিণতিটিকেও উল্টে দিয়েছে উপন্যাস, সেকথা আগে বলেছি। তাছাড়াও, উপন্যাস বলে, "রামচন্দ্র রায় যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, তিনি একজন লঘুহৃদয় সংকীর্ণপ্রাণ লোক।" ঐতিহাসিক বলেন,[১৬] "এ ধারণা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অনৈতিহাসিক।" ইতিহাসে উদয়াদিত্যের অনুজ সংগ্রামাদিত্য ; উপন্যাসে তাঁর নাম সমরাদিত্য।

মনে পড়ে, উপন্যাসে 'ঐতিহাসিক রস'-এর প্রসঙ্গ পেড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[১৭] প্রতিদিনের সাধারণ সুখদুঃখের পরিমাপ মানুষের জীবনে যেখানে অমেয় হয়ে ওঠে, তাই নিয়ে উপন্যাসের কাহিনী। কিন্তু সাধারণ-হয়েও-অসাধারণ সে-কথা যদি এমন জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, কালের রথযাত্রার অনুষঙ্গী যে-জীবন, তা-হলে বৃহৎ এবং ব্যাপকতর আবহধারায় সংযোজিত হয়ে উপন্যাসের জীবন এক নূতন মাত্রা আয়ত্ত করে। ছবিটা রবীন্দ্রনাথ নিজেই এঁকেছেন, যেন[১৮] "রুদ্রবীণার একটা তারে মূল রাগিণী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু-মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর একটা সুদূরবিস্তৃত ঝঙ্কার জাগ্রত করিয়া রাখে।" আসলে ব্যক্তিক প্রেমের ভাবাতুর উদ্বেজনাকে পরিস্ফীত মাত্রায় উপস্থিত করতে পারার রোমান্টিক আগ্রহ থেকেই বুঝি, ইতিহাসের প্রচ্ছদটুকুকে কবিমন আশ্রয় করেছিল। তাছাড়া বহির্জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতাও তখনো ভরাট হয়ে ওঠেনি। ইতিহাসের পশ্চাৎপট দূর থেকে দেখার আবছা আলোয় রহস্যঘন করেছে উপন্যাসের জীবন-কথাকে। বঙ্কিম-প্রবর্তিত ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার পূর্বৈতিহ্যও জমেছিল মোহাতুর কবিমনে।

আসলে ইতিহাসের সাজপোশাকে বাঙালির ঘরের কথাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন কবি আপন মনের মতো করে—'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে' নানা মানুষের যেখানে আনাগোনা।

১৪। "বঙ্গাধিপ পরাজয়"এ 'সরমা' চরিত্র রয়েছে, রবীন্দ্র-রচনায় তার রোম্যান্টিক রূপান্তর 'সুরমা'-য়।

১৫। রমেশচন্দ্র মজুমদার (সঃ)—পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃ. ১৩৬

১৬। তদেব-পৃ. ১৩২

১৭। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-"সাহিত্য"—র. র. ৮—পৃ. ৪৪৮

১৮। তদেব-পৃ. ৪৪৯

তার অন্তরঙ্গে দেশকালের ভাবনাও জড়িয়ে গিয়েছিল অবচেতনায়। রাজ্য ভাঙাগড়ার ছদ্মবেশের গহন হতে তাই বিচ্ছুরিত হতে থাকে বাঙালি যৌথ পরিবারজীবনের সংকটচিত্র,—যে-সংকট আসলে মনোময়।

রাজা বসন্ত রায় ভাইপো প্রতাপকে কোলে পিঠে করে বড় করেছিলেন ; নিঃসন্তান বৃদ্ধের পরম আশ্রয় প্রতাপের সন্তান-সন্ততি, উদয়াদিত্য, বিভা এবং সুরমা। প্রতাপাদিত্যের প্রবল প্রতাপ আর হৃদয়হীন ক্ষমতামত্ততা নিবিড় ভালোবাসার সেই মধুর আঙিনায় রাহাজানি করে ফেরে। উদয়াদিত্য-সুরমা বয়ঃসন্ধি-সমুচ্ছ্বসিত কবিকল্পনার রচিত যুগল-প্রেমের স্বপ্নমূর্তি—আন্তরিক বিপ্রলম্ভের বেদনায় যে নিরন্তর-মিলন অন্তর্ব্যথিত। পিতৃগৃহে ভাগ্য-নির্বাসিতা বিভার মূক বেদনা "সন্ধ্যাসংগীত"-এর নিরুদ্দেশ মনঃপীড়িত ভাবুকতার আরো এক কল্পরূপ। কিন্তু কল্পনার রোহভূমি হতে গল্পকে নামিয়ে আনতে চেয়েছেন অপরিণতমনা শিল্পী চোখেদেখা জীবনের পরিচিত-পরিধিতে। পুত্র উদয়াদিত্যের প্রতি প্রতাপাদিত্যের রোষ-বিমুখতা অপনোদনে অনায়াসে বধূ সুরমাকে অভিযুক্ত করতে পারেন প্রতাপাদিত্যের রানী, বধূর প্রতি পুত্রের একান্ত আসক্তি শাশুড়ির চিত্তকে ঈর্ষাতুর করে তুলতেও পারে। আবার এই শাশুড়িই সুরমার মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। সে শোক তাঁর আন্তরিক—যে-কোনো বাঙালি শাশুড়ির ভাবনার মতোই যথার্থ। ভাবতে ইচ্ছে করে, উদয়াদিত্য-জননীর এই ছবিই কি পরিণতি পায় নি "চোখের বালি"র রাজলক্ষ্মীতে? অন্যপক্ষে, উদয়াদিত্যের প্রেম-সুনিবিড় কল্পমূর্তিকে বাস্তবিকতার ধূলিলিপ্ত করার পথ খোঁজা হয়েছে রুক্মিণী উপাখ্যানের মাধ্যমে।

"বউঠাকুরানীর হাট" আসলে একগুচ্ছ উজ্জ্বল চরিত্রের মালা—কিছু চরিত্র চেনা, আরো কিছু প্রেয়—যাদের পাবার জন্যে মন লুব্ধ হয়ে থাকে। প্রথম দলে কেবল প্রতাপাদিত্য বা তাঁর রানীই নন, তাঁদের দল ভারি এবং সমৃদ্ধ করেছে রুক্মিণী-সীতারাম-ভাগবতেরা মিলে ; অনৈতিহাসিক রামচন্দ্র রায় আর তাঁর বিদূষকও তাই। আর সুরমা তো বয়ঃসন্ধিলগ্ন প্রেমপিপাসুতায় গড়া একটি বঙ্কিম বল্লরী। সুরমা-উদয়াদিত্য-বিভা-বসন্তরায় মিলে প্রেমের এক মায়ালোক গড়ে তুলেছে, প্রতাপাদিত্যের মত্ত পদক্ষেপে যা বিস্রস্ত, এবং বিধ্বস্তও।

মধ্যযুগের পুরুষপ্রধান সমাজে বৃহৎ পরিবারের কাহিনী মনে আসে,—"মনসামঙ্গল"-এর চন্দ্রধরের সংসার। প্রখর পরনিরোধী তার আত্মম্ভরিতা। মনসা পুজোতে তার আপত্তি—অতএব পরিবারেরও কেউ ওমুখো হবে না এই তার পণ। একের পর এক ছেলে সাপের কামড়ে মরে, কিন্তু তাদের মা সনকা কিংবা তাদের তরুণী পত্নীদেরও কাঁদবার উপায়টুকু নেই—যদি শত্রুপক্ষ হাসে। তাহলেও "মনসামঙ্গল"-এর গল্পে চাঁদ সদাগরের বিক্রমটুকুই প্রধান উপজীব্য ; "বউঠাকুরানীর হাট"-এ প্রতাপাদিত্যের সেই আত্মান্ধ বিক্রম সুরমা, উদয়াদিত্য এবং বিভার ট্রাজেডিকেই কেবল উজ্জ্বল করে তোলে নি, বসন্তরায়ের হত্যা সেই ট্রাজেডির বিভীষণ পশ্চাৎপট।

এইখানে উপন্যাসের রঙ ধরেছে গল্পের গায়ে। উপন্যাসকে বলা হয়েছে[১৯] 'আধুনিক

১৯। "Indeed the Iliad is more a picture of the society than of any one of its characters, a society in which the individual does not feel himself in opposition to the collective ; any more than he feels himself in conflict with nature." দ্র. Ralph Fox : "The Novel and the People"—p. 26.

যুগের মহাকাব্য' ; বলা হয়েছে,—"ইলিআড্-এর মতো পুরাতন মহাকাব্যে কেবল সমাজেরই ছবি—চরিত্রের নয় ; সে এমন এক সমাজ যেখানে ব্যক্তিসত্তা কখনো সংঘশক্তির বিরুদ্ধে—কিংবা প্রকৃতিজ শক্তির বিরুদ্ধেও নিজেকে উপস্থাপিত করার কথা ভাবতে পারে না। মধ্যযুগের সাহিত্যে চরিত্রেরা সব সমাজ কিংবা ভাগ্যের হাতের খেলনা। "বউঠাকুরানীর হাট" মানুষের স্বতন্ত্র চরিত্রকে গড়ে তুলেছে : সমাজ কিংবা ভাগ্যের প্রতিস্পর্ধী তারা হতে পারে নি কবির হাতের লেখনীতে ; তাঁর ভাবনাতেও পাক ধরবার সময় হয় নি তখনো। কিন্তু চরিত্রগুলি তাদের নীরব বেদনার ভাষায়, সমাজ-সংগঠন, তার পুরুষপ্রধান নির্মায়িকতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ সংবেদনা সঞ্চার করতে পেরেছে, এইখানেই রবীন্দ্র কল্পনায় উপন্যাসকলা-ধর্মের প্রথম পদসম্পাৎ।

আখ্যানের গঠনে উপন্যাসোপযোগী কার্যকারণের সম্মিতি কিংবা আনুপূর্বিকতা গড়ে উঠতে যে পারে নি, সেকথা ইতিহাস-বনাম-উপন্যাসের আলোচনায় লক্ষ করেছি। তবু কিছু জীবন্ত চরিত্রের অবাধ সঞ্চলনের সূত্রে, পুরাকথার পৃষ্ঠ জুড়ে, কবির নিজের কালের জীবন-নির্বেদ—যৌথ পরিবার-ভাঙা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দুর্মর আক্ষেপ, সমস্ত কাহিনী জুড়ে নিরন্তর আলোড়িত হয়ে চলেছে। এইখানেই কবির হাতে উপন্যাসের প্রথম অঙ্কুরটির উন্মোচন হতে পারল গল্পের কাঠামোয়। ইতিহাসকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্র-মন আসলে বাঙালির জীবন-কথার রহস্যলোকেই বিচরণ করে ফিরেছে এই ঘাটে।

"বউঠাকুরানীর হাট"-এর পরে "রাজর্ষি" (১২৯২-৯৩) উপন্যাস যত, তার চেয়ে বেশি গালগল্পই। নিছক গল্পের জন্যেই গল্পের একটা স্বতন্ত্র আবেদন আছে—গল্প যেখানে শিল্পীর হাতে-গড়া জীবনদেখার আয়না। তাই রূপকথা-লোভী শিশু সেই গল্পের নেশায় ঢুলতে ঢুলতেও নিরন্তর প্রশ্ন করে চলে, 'তারপর'—'তারপর?'[২০] বড়দের মনে সেই নেশার জোগান দিতে দামোদর মুখোপাধ্যায় জনপ্রিয় হয়েছিলেন "কপালকুণ্ডলার"র পরিশিষ্ট "মৃন্ময়ী" লিখে—কিংবা "দুর্গেশনন্দিনী"র পিঠে "নবাবনন্দিনী আয়েষা"! নেশার ঝোঁকে শিল্পের মাত্রা হারায়, তার বাঁধুনি শিথিল হয় ; তবু গল্প-রসের মাদকতা একটা থাকেই।

"রাজর্ষি"রও মূল কল্পনা শিশুমনে গল্পের খোরাক জোগাতে। 'মেজবোঠান' জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর অনুরোধে ঠাকুর বাড়ির বালকবালিকাদের সাহিত্যক্ষুধা নিবারী "বালক" পত্রিকার (১২৯২) গহ্বর পোরাতে তার জন্ম। রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন,[২১] মাসিকপত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। অতএব "ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হল।" তাছাড়া প্রধানত 'শিশু-পাঠকই লক্ষ্য' ছিল বলেও লেখায় 'বাজে বাচালতার সংকোচ থাকে না',—এ-ও তাঁরই কথা। "রাজর্ষি"র কাহিনী শেষ হয়েছিল চুয়াল্লিশ পরিচ্ছেদের পরেও একটি 'উপসংহার' যোজনা করে। অথচ কবির ধারণা,—প্রথম পনেরো পরিচ্ছেদেই গল্পের সহজ পরিণতি সাধিত হয়েছে।

কিন্তু সে পরিণতিও গালগল্পেরই ; ইংরেজিতে যাকে 'টেল' বলা চলে। উপন্যাসের চরিত্র "রাজর্ষি" আয়ত্ত করতে পারে নি মোটেই। আর তার কারণ সবটাই বহিরাগত নয়। কবি

২০। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. ভূদেব চৌধুরী—"বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার" (চতুর্থ সং)-পৃ.১৩

২১। 'সূচনা'—"রাজর্ষি"—র-র. ২

Indian Institute of Advanced Study
ACC NO. 113484
DATE 23.3.04

জানিয়েছেন, মূল গল্পাংশটি স্বপ্নে পাওয়া ; আসলে "রাজর্ষি" আগাগোড়া মনগড়া,—সমসাময়িক কবিমনোভাবনার ফসল। ১২৯১ সালের আশ্বিনে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—সমগ্র মন-প্রাণ তখন ঐ ভাবনায় উদ্বেলিত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন,[২২] আদি সমাজের সম্পাদকতা লাভের পর চার মাসে ৩২টি ব্রহ্মসঙ্গীত লিখেছিলেন ; আর একই সময়ে রক্ষণশীল হিন্দু 'পুনরুজ্জীবনে'র বিরুদ্ধেও বিতর্কমুখর লেখনী হয়েছিল প্রখর। আসলে চলতি রেলের গাড়িতে ঐ স্বপ্নদেখাও সমকালীন মানসিকতার উৎসজাত। তাই নিয়ে গড়া শুরু হয়েছিল শিশু-'উপন্যাসে'র পসরা। এর আগেও ত্রিপুরার রাজ-কাহিনী নিয়ে শিশুগল্প লিখেছিলেন 'মুকুট'—"বালকে"র পৃষ্ঠাতেই[২৩] ; সরল, ঋজুভঙ্গিতে তরতরিয়ে এগিয়ে যাওয়া বিবরণাত্মক একটি কাহিনী। "রাজর্ষি" প্রথমাংশের গঠনও তেমনি ; অনতি গভীর সাবলীল বিবৃতির ভেতর হতে সহজে শিশুমনের কৌতূহল আর আবেগ কাঁপিয়ে তোলার কারুকলা। মন-মাতানোর খেলা আছে নানা রকমের, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস-বিশ্লেষণের চেষ্টা নেই কোথাও। গল্প, তার ফলে, সুনিশ্চিত স্বাভাবিকতাবোধের বৃন্তে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে নি।

যে ঘটনা-পরম্পরার সূত্রে গোবিন্দমাণিক্য বংশানুক্রমিক বলিদান-প্রথা রহিত করার অমোঘ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন, তার পশ্চাৎবর্তী মনঃপ্রেরণা অনিবার্য সম্ভাব্যতার মাত্রা স্পর্শ করতে পারে নি ; শেষ পর্যন্ত হাসির অকাল মৃত্যুর ভাবালুতা সঞ্চার করে শিশুচিত্তের কাছে তাকে সুসিদ্ধ করে তোলা হয়েছে। কিংবা হাসি-তাতার সঙ্গে রাজার প্রাথমিক সংযোগ—ফুল তোলার খেলা—এর সবটুকুই রূপকথা-পিপাসু শিশুমনের লোভনীয় খোরাক, উপন্যাসের বাস্তবিকতা-বোধে সমর্থিত নয়। আসলে ঘটনা কিংবা চরিত্র, সব-কিছুই, মন-ভোলানোর মদির আবেশ-ঘন ; পরিচ্ছন্ন পরিস্ফুটতা এই পর্যায়ে শিল্পীর কাম্য নয় বলেই হয়ত অনুপস্থিত। চরিত্র-সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যদীপিত যে-সজীবতা "বউঠাকুরানীর হাট"-এর মুখ্য সম্পদ, "রাজর্ষি"তে তা প্রায় অনুপস্থিত। রঘুপতি, নক্ষত্র রায় এবং, কিছু পরিমাণে, জয়সিংহের মধ্যে ব্যক্তিত্বের একটা গতিচিহ্ন যদি-বা রূপরেখায়িত হয়ে থাকেও, তার বেশি, কিংবা ততটাও, আর কোথাও একেবারেই অনুপস্থিত।

স্বয়ং গোবিন্দমাণিক্য ঘটনাবলির পরিবাহক যতটা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ততটা নন। কিংবা দুই বছরের তাতা, তথা চার বছরের ধ্রুবর মুখে যে-দুটি গান তুলে দেওয়া হয়েছে, " 'র'য়ে,-'ল'য়ে-'ল'য়ে-'ড'-'দ'য়ে উলট পালট করিয়া অর্ধেক কথা মুখের মধ্যে রাখিয়া, অর্ধেক কথা উচ্চারণ করিয়া"-ও এ-সব শ্লোক কি মোটেই ঐ শিশুর জিহ্বা, কণ্ঠ কিংবা হৃদয়ে প্রতিফলিত হবার মতো? আসলে ঘটনার পিঠে মনোহর ঘটনার মালা গেঁথে গল্পের পক্ষিরাজ শিশুকল্পনার আকাশে ছুটেছিল যেন অবাধ-বিহারে।

তাহলেও এখানেই শেষ নয়। "রাজর্ষি"র কাহিনী শেষ পর্যন্ত ছোটোদের হাত ফস্কে বড়োদের দরবারে পৌঁছে যেতে চেয়েছে। 'ষড়বিংশ' পরিচ্ছেদ পর্যন্তই কেবল "বালক" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—১২৯২-এর ফাল্গুন সংখ্যা অবধি। তারপরে আর ছাপা হয়

২২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী"—পৃ. ২৫
২৩। "বালক পত্রিকা" (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৯২)

নি। পরে ১২৯৩-এ গোটা কাহিনীটি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। ঐসময় থেকেই ধীরে ধীরে গল্প-শিল্পীর ভাবনা প্রত্যক্ষভাবে "বালক"-পাঠকদের প্রসঙ্গ থেকে দূরপ্রসৃত হয়েছে, এবং তার ফলে প্রথমাবধি আত্মভাব-মগ্ন রচনা এবারে অনায়াসে মন্ময় কবিকল্পনার কোরক হয়ে ফুটেছে।

লক্ষ করবার বিষয়, কাব্যে "ছবি ও গান", আর নাটকে "প্রকৃতির প্রতিশোধ" তখন গ্রন্থিত হয়ে গেছে। অপ্রেম হতে প্রেমে, সীমা হতে অসীমে, বিসংবাদ হতে মিলনে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা তখন কবি-চেতনায় উন্মুখ। "রাজর্ষি"র এই পরবর্তী পর্যায়ে সেই নিভৃত কবিবাসনাই কাহিনীরূপ ধরেছে। ধ্রুব-বিলগ্নমনা গোবিন্দমাণিক্য যেন "প্রকৃতির প্রতিশোধ"-এর সন্ন্যাসীর বিপরীত মেরুতে প্রতিষ্ঠিত, 'প্রকৃতি'র অনুমোদনে ও লালনে প্রেমের সাধনাই যাঁর পরিণামী জীবনাগ্রহ।

নতুন পুরোহিত বিল্বন রবীন্দ্র-কল্পনার সেই 'মরমিয়া' মানব-সাধক, মনে-প্রাণে মানুষের সন্ধান, মানুষের আবিষ্কার যাঁর জীবন-ব্রত। বিল্বন—পরবর্তী রবীন্দ্র নাটকের বৈরাগি-বাউল-ঠাকুরদা-দের পূর্বসূরী। আর গোবিন্দমাণিক্য-বিল্বনের কথোপকথনে, আচারে-আচরণে কবির কল্পলোকের ভাবনা বাণীরূপ ধরেছে কাহিনীর শরীরে।

রাজ্য ত্যাগ করে যাবার সময়ে গোবিন্দমাণিক্য গেরুয়া পরেছিলেন,—বিল্বনকে বলেছিলেন, "আমি ধ্রুবের মধ্যে আত্মসমাধান করিয়া ধ্রুবের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিব। আমি প্রথম হইতে ধ্রুবকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিব। ধ্রুবের সহিত তিলে তিলে আমিই বাড়িতে থাকিব। আমার মানবজন্ম সম্পূর্ণ করিব। ঠাকুর, আমি মানুষের মতো নই, আমি রাজা হইয়া কী করিব?"

পরবর্তী কালে রবীন্দ্র-কল্পিত 'মানুষের ধর্ম'র সাধনার পূর্বসূত্র এখানে স্পষ্ট বিমূর্ত হতে দেখি। আর এ-কথাও মানতেই হবে, এই গভীর নিবিড় জীবন-ভাবনা কখনোই শিশু-মানসিকতার উদ্দেশ্যে উৎসারিত হওয়া সম্ভব নয়।

গোবিন্দমাণিক্য শেষপর্যন্ত ধ্রুবকেও সঙ্গে নিতে পারেন নি, ব্যথাহত মনে বিজনবাসী হয়েছিলেন। কিন্তু একদিন তিনি দেখতে পেলেন, "নির্জনে ধ্যান পরায়ণা প্রকৃতি যে স্নেহধারা সঞ্চয় করিতেছে, লোকালয়ের মধ্যে তাহা নদীরূপে প্রেরণ করিতেছে...।" অতএব, "গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, 'আমিও আমার বিজন-সঞ্চিত প্রেম স্বজনে বিতরণ করিতে বাহির হইব। বলিয়া তাঁহার পর্বতাশ্রম ছাড়িয়া তিনি বাহির হইলেন।"—এ-ছবি তো প্রব্রজিত কবি-পিতা দেবেন্দ্রনাথের গৃহ-প্রত্যাবর্তন-কাহিনীর স্বপ্নমণ্ডিত! কিংবা দুর্গপ্রাকারে ছড়িয়ে যে 'বড়ো পাঠশালা' খুলেছিলেন গোবিন্দমাণিক্য, তার মূল-নিহিত প্রচ্ছন্ন ভাব-প্রেরণাই কী বহুদিন পরে কায়া লাভ করেছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিদ্যালয়ের আয়তনে! "রাজর্ষি"র প্রকাশ কালে মাধুরীলতার জন্ম হয়ে গিয়েছিল (২৫ অক্টোবর, ১৮৮৬); গ্রন্থের রচনাকালে পিতা যদি না-ও হয়ে থাকেন, কবিচেতনা তখন পিতৃত্ব-সম্ভাবনায় হিল্লোলিত।

আর বিল্বন! তাঁকে চিনি হিন্দু সন্ন্যাসী হয়েও যখন দুর্গত পাঠানদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে হিন্দুদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, অকম্প্র কণ্ঠে তখন ঘোষণা করেছিলেন—"আমি সন্ন্যাসী, আমার কোনো জাত নাই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে, তখন কিসের জাত!" উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্মণের পরিকল্পনা তরুণ ব্রাহ্মসমাজ-সম্পাদকের অব্যবহিত উত্তেজনা-প্রসূত হয়ও যদি, বিল্বন-ব্যক্তিত্বের গভীরে তবু রবীন্দ্র-

ভাবনার শাশ্বত মানব চরিত্রের বিভা প্রদীপ্ত। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁচিশ বছর ; ভরা যৌবনের স্বপ্নাবেগ ভরে 'মানুষের ধর্ম'র সারাৎসারটুকু আহরণ করতে চেয়েছে কবিমন বিল্বন চরিত্রের রূপরেখায়। রবীন্দ্র-নাটকের প্রথম হতেই 'আইডিয়া'-প্রাধান্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। উপন্যাসের জগতে "রাজর্ষি" শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের ছদ্ম-প্রচ্ছদে কবি-কল্পনা-মথিত 'আইডিয়া'রই গল্পরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। "রাজর্ষি"র নামকরণেও সেই ব্যঞ্জনা। রাজা হতে গিয়ে গোবিন্দমাণিক্য 'মানুষ' হতে পারেন নি। মানুষ হয়ে—'আপনাকে জয়' করতে পেরে সকলকে জয় করার আত্মিক সামর্থ্য যখন তাঁর জন্মেছে—তখনই তিনি দ্বিতীয়বার রাজা হবার অধিকার অর্জন করেছেন। ঐখানেই রাজা গোবিন্দমাণিক্যের 'রাজর্ষি'ত্বে মানবিক উত্তরণ। ঐখানেই অন্যথা গালগল্পধর্মী রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের ধারায় এই রচনাটির যা-কিছু স্বকীয়তা।

"বউঠাকুরানীর হাট"-এ মানুষ খুঁজতে বেরিয়েছিল কবি-মন, মানুষের ব্যথাকে নিভৃত-সন্তর্পণে স্পর্শ করে ফিরতে চেয়েছিল। "রাজর্ষি"তে 'মানুষের ধর্ম'কে আবিষ্কার করে—তাকে স্বীকার করে সে তৃপ্ত-পরিণাম! "বউঠাকুরানীর হাট"-এর গল্প চরিত্রের সজীবতায় জীবন্ত ; "রাজর্ষি" ভাবাকুলতার আবেশে কেবলই গল্প,—গালগল্প।

তাই "বউঠাকুরানীর হাট"-এর চেয়েও আপাত-ইতিহাসের প্রচ্ছদটুকু এখানে আরো অবান্তর। ত্রিপুরার রাজ-ইতিহাসের প্রতি কবি-মনের আগ্রহের একাধিক কারণ ছিল ; "ভগ্নহৃদয়" প্রকাশিত হতেই (১৮৮১) ত্রিপুরাপতি বীরচন্দ্রের প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছিল ; আর পরবর্তী কালের ত্রিপুরার 'রাজমালা' সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহ তখন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাঁর কাছেই ত্রিপুর-রাজ-ইতিহাসের প্রাথমিক উপকরণ রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত পেয়ে থাকবেন। পরে[২৪] স্বয়ং ত্রিপুরাধিপতির কাছেও তথ্যোপদান চেয়েছিলেন তিনি ; পেয়েওছিলেন। কিন্তু তার ব্যবহার হয় নি। নিজেই স্বীকার করেছেন,[২৫] "রাজর্ষি"তে আমি কিন্তু আমার কল্পনায় পরিবেশ এঁকেছি।" তাতে ইতিহাসের সঙ্গে অনেক পার্থক্য। ইতিহাসে নক্ষত্র রায় গোবিন্দমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভাই ; ঈর্ষাতুর-ষড়যন্ত্রপর ; মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবার হতে সৈন্য সংগ্রহ করে গোবিন্দমাণিক্যকে উৎখাত করতে এসেছিলেন। উপন্যাসে নক্ষত্র রায় ভ্রাতৃস্নেহাতুর গোবিন্দমাণিক্যের ব্যক্তিত্বহীন অনুজ ভ্রাতা, রঘুপতির তাড়নায় সুজার সৈন্য-সাহায্যে ত্রিপুরার সিংহাসনে আসীন হন। ইতিহাসে সুজার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল আরাকান রাজদরবারে। অতএব, পাদটীকায় ইতিহাসের প্রসঙ্গ-নির্দেশ কিংবা গ্রন্থের অন্তিম অংশে ইতিহাস-গ্রন্থের উদ্ধৃতি সত্ত্বেও "রাজর্ষি" একান্তভাবে 'মানুষের ধর্ম'-ভাবিত তরুণ কবিমনের ফসল ; ইতিহাসের তথ্যে কিংবা অব্যবহিত জীবনের পটভূমিতে কোথাও এ-কবিকল্পনার অনুপ্রেরণা খুঁজে পাওয়া কঠিন!

রবীন্দ্র-সৃজন-ধর্মের মৌল প্রবণতাটি আসলে "ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।" আর উপন্যাসের শিল্প-রূপ একান্তভাবে বাস্তব জীবনের রূপায়তন আশ্রয় করেই তার

২৪। "রাজর্ষি"র ২৬ অধ্যায় পর্যন্ত "বালক"-এ প্রকাশিত হবার পরে : দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্রজীবনী"-১ (চতুর্থ সং)—পৃ. ২২১

২৫। দ্র. দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত—'রবীন্দ্রতীর্থ পরিক্রমায় মহারাজ বীরবিক্রমের সঙ্গে'—"রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা"—পৃ. ১২১

ভাবমূর্তিটি আহরণ করে। রবীন্দ্র-উপন্যাসে বাস্তব-সংশ্লিষ্ট জীবন-কথাকে অবলম্বন করেও বস্তূত্তরণের,—ভাব-সংপ্রতিষ্ঠতার আগ্রহ আন্তরিক। পরবর্তী পর্যায়ের রচনাধারায় রূপ-ভাবের বিচিত্র বিমিশ্রণের কলা-কৃতিই প্রধান কৌতূহলের বিষয়। আলোচিত অপরিণত রচনাগুচ্ছে সেই বিমিশ্রণের হাতিয়ার-চিহ্নটুকু কেবল দেখা গেল। "করুণা"তে চলমান জীবন-সমস্যার বস্তুচ্ছবিটির প্রতি শিল্পীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ; "বউঠাকুরানীর হাট"-এ ভাবাতুর জীবনের গভীরে কঠোর বাস্তবিকতার স্থূল হস্তাবলেপ কেবল আভাসিত। এই সব-কিছুর চাপ হতে ছুটি চেয়ে "রাজর্ষি"তে কবি-ভাবুকতা যেন স্বপ্নবিহার করতে চেয়েছে 'মানুষের ধর্ম'-ভাবনার আইডিয়ামুখ্য কল্পলোকে। আলোচ্য রচনা তিনটির একটিও উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি ; তবু রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক চরিত্রের রূপরেখায়িত কুঞ্চিকা হিসেবেই এদের স্মরণীয়তা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১)

উপন্যাসের সম্পর্কে বলা হয়েছে,[১] "এ-সেই শিল্পরূপ যা সম্পূর্ণ মানুষকে গ্রহণ করে অভিব্যক্তি দিতে চেয়েছে।"

মানুষই আসলে 'সহস্রশীর্ষ', দেহ-মন-বুদ্ধি-অহংকার-এ ঘেরা অস্তিত্বের প্রতিরন্ধ্রে যার নিরন্তর নূতন প্রকাশ। অব্যবহিত প্রেরণাসূত্রে সে প্রকাশ প্রতিপদে স্বতোবিচ্ছিন্ন ; সত্তার সমগ্রতার প্রসঙ্গে খণ্ডিত বলে তা অযথার্থ-ও। ওথেলো কে কী খুনি বলতে পারি ডেস্‌ডিমোনার মর্মান্তিক হত্যার পরেও ; কিংবা যদি তাই বলি, সে পরিচয় কতটা সত্য এবং সার্থক ? অন্যপক্ষে "বিসর্জন"-এর রঘুপতিকে কপটাচারী 'ভিলেন' বললে ভুলই বলা হয়।

"চোখের বালি"র প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,[২] 'আসল প্রয়োজন আঁতের কথা বের করে দেখানো।' সে-কেবল ঘটনা বা আচরণের ভেতরকার নয়—ঘটনা যে ঘটায়, কিংবা আচরণ যে করে, তারও অন্তঃকরণের নিগূঢ়তম রহস্যটি ; তার ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র সামগ্রিক পরিচয়। এ-পরিচয় তথ্যের খুঁটিনাটি মিলিয়ে পাবার নয়, ব্যক্তিসত্তার মৌল চারিত্রের নিরিখেই তার বিচার। তা খতিয়ে দেখবার কষ্টিপাথরটি যে-কোনো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বচেতনার স্বাতন্ত্র্যে। আগেও বলেছি, মানুষের অস্তিত্ব জৈবধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের—প্রকৃতি-পারবশ্যের পীড়াবোধের সঙ্গে নিরঙ্কুশ আত্মকর্তৃত্বচিন্তার বিরোধ-বিভেদ-সমন্বয়ের আকুলতায় রূপরেখায়িত। আর সে দ্বন্দ্বের মাত্রা হতে পারে দুরকমের ; সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির, কিংবা একই ব্যক্তির ভেতরকার সমষ্টি এবং ব্যষ্টিসত্তার দ্বন্দ্ব।

অন্যপক্ষে এ-কথাও সত্য, উপন্যাস সেই জীবনেরই ফসল, যেখানে এ-দুয়ের ভারসমতা-বিধায়ক চাপটি অন্তত দুর্বল হয়ে গেছেই। উপন্যাসের জন্মলগ্নে সর্বত্রই দেখা গেছে, ব্যক্তি তার স্বতন্ত্র সত্তার অধিকার-কামনায় পরিবেশ, প্রকৃতি, সমাজ—সব কিছুর সঙ্গেই সংগ্রাম-রত। তারই ফলে, আর সব সাহিত্যের মতো বঙ্কিমের হাতে রচিত বাংলা সাহিত্যেরও প্রথম উপন্যাসগুচ্ছ সমস্যাপ্রধান—সমাজ-প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাতে যে-সমস্যা অনপনেয় হয়ে ওঠে।

"চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের কাহিনী সে-কালের সামাজিক উপন্যাসের একটি উৎকৃষ্ট কুঞ্চিকা। শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম এক দুঃসাহসী পরিকল্পনাতেই লিপ্ত

১। "..., the first art to attempt to take the whole man and give him expression"—Ralph Fox—"The Novel And The people"—p. 2

২। দ্র. "চোখের বালি" সূচনা—র. র. ৩

হয়েছিলেন,—সধবা নারী—তথা বন্দনীয় স্বামীর ঘরনীর পক্ষে পরপুরুষ-কামনায় গৃহত্যাগ—অথবা 'কুলত্যাগ' যদি বলি সামাজিক সংস্কারের পরিভাষায়! অথচ চন্দ্রশেখরের প্রতিও শৈবলিনীর মন ছিল শ্রদ্ধানুরাগে নিবিষ্ট। চন্দ্রশেখরের গুরুর প্রশ্নের উত্তরে 'যোগবল'-আক্রান্ত শৈবলিনী বলেছিল "আমরা এক বৃন্তে দুইটি কুসুম ফুটিয়াছিলাম, ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলে কেন?" কিংবা প্রতাপের বিমুখতার জবাবে আকুল প্রশ্ন করেছিল, "আমি তোমায় দেখিয়াছিলাম কেন, দেখিয়াছিলাম তো পাইলাম না কেন, না পাইলাম তো মরিলাম না কেন?"

এ-সব জলন্ত জিজ্ঞাসাই তো সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে—সগোত্র বিবাহে যে অন্তরায় হয়েছিল! বস্তুত বঙ্কিম-উপন্যাসে সমাজ আপন বহিরঙ্গ পটভূমি হতে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, ব্যক্তি তারই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া রচনা করে দ্বান্দ্বিকতার রথচক্র এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাই বঙ্কিমের উপন্যাস ঘটনা-প্রধান, বাইরের অভিঘাত-কোণ হতে উপন্যাসের জীবনধারাকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে বলে ব্যক্তির আঁতের কথা তাতে স্পষ্ট ধরা পড়তে পারে নি। "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর প্রথম সংস্করণে রোহিণীর যে ছবি ঘটনা-পরম্পরায় গড়ে উঠেছিল, বঙ্কিমের ভাষায় সে যদি 'পাপিষ্ঠা'ই হয়, তাহলে পরবর্তী সংস্করণের পরিবর্তিত ঘটনা সূত্রে যে-রোহিণী পরিস্ফুট, তাকেও কি তাই বলা চলে? আর তাই যদি হয়, তাহলে জীবনের ভয়ানকতম অন্ধকারলগ্নে গোবিন্দলালের 'জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইয়া উঠিল' কি করে? বঙ্কিম-উপন্যাস সমস্যার দুরপণেয়তাঘন ; সমাজশক্তির সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য-জাগ্রত ব্যক্তিসত্তার বিরোধের চক্রাবর্তটি তাতে পূর্ণ চিত্রিত। তাহলেও ব্যক্তিসত্তার আদিঅন্তে সমগ্র পরিচয় তাতে নির্দ্বিধ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নূতন শিল্প-সচেতনা নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ।

আগে বলেছি, জীবনকে ধরে—জীবন ভরতে চাওয়াই সাহিত্যের কাজ। অন্যপক্ষে উপন্যাসের প্রত্যক্ষ অবলম্বন হল চোখে-দেখা বাস্তব জীবন। সে জীবন তার বস্তুগত অস্তিত্বের জড় প্রতিফলন নয়, বরং জীবনকে দেখে রচনা যিনি করেছেন, এ তাঁরই মনোভাবনার নির্যাস-খচিত। অতএব, বঙ্কিম-উপন্যাস হতে রবীন্দ্র-উপন্যাসের তফাত উভয়ের চোখে-দেখা অভিজ্ঞতারই তফাত নয় কেবল, তাঁদের চোখে দেখার ভঙ্গিরও তফাত। এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধ উপন্যাস তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার ফসল যত, অন্তত ততটাই তাঁর জীবন-সচেতনতার অভিব্যক্তি।

(২)

সেই সচেতনতা সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ মানুষকে,—ব্যক্তিমাত্রকেই ভেতর হতে দেখতে চেয়েছেন। বঙ্কিমের দৃষ্টি জীবনের বাইরের ঘটনাপ্রবাহের অনুসরণে অন্তর্মুখী হতে চেয়েছে যথাসম্ভব ; রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির অন্তঃকরণের প্রবণতার প্রেক্ষিতেই তার বহির্জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-অবস্থান্তরের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। এই অর্থেই রবীন্দ্র-উপন্যাস ঘটনাপ্রাধান্যের জগৎ ছেড়ে মনোরহস্যানুসন্ধানের অভিমুখী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসকে মনস্তত্ত্ব-সন্ধানী বলিও যদি, হ্যাভলক অ্যালিস-সিগমুণ্ড ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সঙ্গে তার কোনো যোগই নেই। রবীন্দ্র-উপন্যাসে তাঁর স্বাধীন জীবন-সচেতনার প্রথম অভিব্যক্তি "চোখের বালি"তে।

এবারে সেই জীবন—সেই সচেতনার হিসেব খোঁজা যেতে পারে। "রাজর্ষি" উপন্যাস

প্রকাশের (১২৯৩) প্রায় তের বছর পরে "চোখের বালি"র ভাবনারম্ভ, ১৩০৬ সালের ৪ আষাঢ় তারিখে জগদীশচন্দ্র বসুকে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন,[৩]—তাঁদের পূর্বশ্রুত অসম্পূর্ণ গল্প 'বিনোদিনী' আবার তিনি লিখতে শুরু করেছেন ; তারপরেও ১৩০৭-এর ২৬ শ্রাবণ অবধি লেখাটি যে শেষ হয় নি, প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিতে তার হদিশ আছে।[৪] ১৩০৮-এ নবপর্যায় "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার তাগিদেই "চোখের বালি"র পূর্ণায়তি। তাহলেও তার জন্ম-উৎস ঐ ১৩০৬ কিংবা অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিভাবনার মূল হতেই খুঁজতে হয়—খ্রিস্টাব্দের তখন ১৮৯৮-৯৯ ; উনিশ শতকের অন্তিম সীমা।

তাহলেও, রচনাকালের সঙ্গে উপন্যাস-ঘটনার কাল না-মিলতেও পারে। আসলে, রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রচ্ছদ সাধারণভাবে ঐ দুই কালের মধ্যে কবি-মনোভাবনার যোগাযোগের ফসল। যে-সময়ের পরিমণ্ডলে উপন্যাসের পরিকল্পনা, তার একটা ছাঁচ ঔপন্যাসিকের মনে ধরা থাকেই। আবার অব্যবহিত অভিজ্ঞতার চাপও তার ওপরে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে প্রতিফলিত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মতো নিরতিশয় জীবন-সম্পৃক্ত শিল্পীর ক্ষেত্রে সে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা।

"চোখের বালি"র গল্প-কাল আভাসে-ইঙ্গিতে উপন্যাসের শরীরেই ছড়ানো আছে।—বিনোদিনীর স্বল্পবিত্ত বাবা বাড়িতে 'মেম' রেখে মেয়েকে 'বহু যত্নে লেখাপড়া এবং কারুকার্য' শিখিয়েছিলেন। য়ুরোপীয় ধর্মযাজিকা মহিলারা এক সময়ে স্বল্প কিংবা বিনা পারিশ্রমিকে বাঙালি হিন্দুর ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের পড়িয়ে আসতেন। ১৮৬৮ সালেও সেই সাধারণ পাঠক্রমে ছিল[৫] 'সামান্য সাহিত্য, অঙ্ক ও বিদ্যাসাগরের বঙ্গদেশীয় ইতিহাস পাঠ'। সূচিশিল্পের সুচারুতা ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজিও অল্পবিস্তর পড়ানো হত। ইংরেজি পড়ার অনায়াস অভ্যাস যদি তাতে হয়েও থাকে—এলাহাবাদ স্টেশনের কাচে-ঘেরা বাক্সে বিহারীর নাম ঠিকানা লেখা চিঠি দেখেই বিনোদিনী পড়ে মনোগত করে নিয়েছিল—তাহলেও, তার আগাগোড়া ব্যক্তিত্বটি ছিল মার্জিতরুচি নিটোল এক বাঙালিনীর ; বাংলা বিদ্যার অধিকারেই সে বিদূষী। বারাসতে প্রথম সাক্ষাতের সময়ে বিহারীর ঘরে নিজের নাম লেখা বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর 'গ্রন্থাবলী' সে সাজিয়ে রেখেছিল ; "বিষবৃক্ষ" এবং "দেবী চৌধুরাণী" পড়েছিল পরে মহেন্দ্রকে উপলক্ষ করে। তার জীবনের চরম সংকটে বিহারী অনুযোগ করে বলেছিল, বিনোদিনীর প্রেমোদ্বেজনা তার উপন্যাস-পড়া মনের বিভ্রান্তি।

অন্যপক্ষে, আশা স্বামীর ঘরে এসেছিল প্রায় নিরক্ষর হয়ে ; তার বিদ্যার সীমানা কোনোদিনই "চারুপাঠ" পার হয়ে বড় একটা এগোতে পায় নি। তাছাড়া সমসাময়িক তরুণ রুচি মেয়েদের বিদ্যানুরাগী হলেও সমাজে তখনো স্ত্রী-শিক্ষা সহজ স্বীকৃতি পায় নি—রাজলক্ষ্মীর কথা ও আচরণে তার পরিচয় আদ্যোপান্ত।

সব মিলিয়ে "চোখের বালি"র গল্প নিশ্চয় ১৮৬৮-র পরেকার, কিন্তু ১৮৮৩তে প্রথম

৩। দ্র. "চিঠিপত্র"—৬ : পত্রসংখ্যা ২—পৃ. ৩-৪

৪। দ্র. "চিঠিপত্র"—৫ : পত্রসংখ্যা ১১৯—পৃ. ১১৭

৫। দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার—"বাংলাদেশের ইতিহাস"—তৃতীয় খণ্ড (উদ্ধৃতি)—পৃ. ৩২৭-২৮

মহিলা-গ্র্যাজুয়েট পাশ করে বেরোবার অদূরবর্তী সময়ের। দীনবন্ধুর শেষ নাটক প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৩-এ, তাঁর "সুরধুনী কাব্য" দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম গ্রন্থন কাল ১৮৭৬—আর বঙ্কিমের "দেবী চৌধুরাণী"র ১৮৮৪।

তাহলেও সাহিত্যে জীবন-জিজ্ঞাসা সন-তারিখের হিসেব নিয়ে নয় একেবারেই ; তার কালচেতনা গুণগত। সেই নিরিখে বুঝি, "চোখের বালি"-র কাল বাঙালি শিক্ষিত নাগরিক সমাজের ইতিহাসে "করুণা"র উত্তর-ভূমিতে। আগে দেখেছি, "করুণা" কলকাতার নাগরিক জীবনের সেই পর্যায়ের চালচিত্র, ইংরেজি শিক্ষার প্রথম অভিঘাত যখন বাঙালি সমাজের একটা বিরাট অংশে ঐতিহ্য-বিচ্ছিন্ন উচ্ছৃঙ্খলতার সঞ্চার করেছিল—তথাকথিত 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর যথেচ্ছ-আচার! মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" (১৮৬০) কিংবা দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী"র (১৮৬২) অভিজ্ঞতারই নূতন অভিব্যক্তি তাতে। সে-ছবি মোটামুটি উনিশ শতকের প্রথমার্ধের। নতুন শিক্ষার ছোঁয়া তখনো মনের ঘরে আলো জ্বালায় নি, কিন্তু তার উত্তাপ ধোঁয়াটে-জমাট হয়ে আছে। ঐ শিক্ষারই পরিমার্জনা-খচিত উত্তরকালীন জীবনের সমস্যা ও সংকট নিয়ে "চোখের বালি"র কাহিনী। সেই সঙ্গে রচয়িতার মনের দেশকাল তার গভীরে নূতন মাত্রা যোজনা করেছে।

"করুণা"র গল্পমূল পূর্বসূরীদের রচনা হতে অনভিজ্ঞ শিল্পিমনের সংগ্রহ ; কিন্তু "চোখের বালি"র প্রচ্ছদ অনেকটাই তাঁর নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতা ও ভাবনা-সম্ভব। দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে রবীন্দ্রনাথের দিদি-বৌদিরা 'মেম'-এর কাছে গৃহ-শিক্ষা পেয়েছিলেন অনেকেই। বিশেষ করে স্বর্ণকুমারী দেবী কবির চেয়ে বছর পাঁচেকের মাত্র বড়ো ছিলেন : ১৮৬৭-তে তাঁর বিয়ের সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছয় পূর্ণ হয়েছিল। 'ন-দিদি'র শিক্ষা ও সাহিত্যপ্রীতির তাৎকালিক সংস্কার রবীন্দ্রমনে ধরা থাকা কিছু বিচিত্র নয়।

অন্যপক্ষে মহেন্দ্র-বিহারী দুজনেই শহুরে উচ্চবিত্ত ; তাদের সম্পদ-সমৃদ্ধির উৎস যে গ্রামের ভূম্যধিকার, তার ইঙ্গিতও উপন্যাসে রয়েছে। বিহারী সম্পর্কে মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে বলেছিল, "নায়েব-গোমস্তায় তাহার বিষয়সম্পত্তি দেখে" ; আর রাজলক্ষ্মীকে বিবাহকালে যে-গ্রামটি তাঁর শ্বশুর যৌতুক দিয়েছিলেন, মৃত্যুপূর্বে তাই তিনি বিহারীর সেবাব্রতে উৎসর্গ করে যান। আবার ধনিগৃহের নিঃসন্তান বিধবা অন্নপূর্ণা তাঁর অগাধ স্নেহ আর অনধিকারের ব্যথায় পরিবারের ভেতরে এবং বাইরে অন্তর্বিদ্ধ হয়ে থাকেন। খুব দূরগত হলেও রবীন্দ্রনাথের পিতৃব্য-পত্নী, নগেন্দ্রনাথের নিঃসন্তান বিধবা, ত্রিপুরাসুন্দরীর অভিমানী স্বেচ্ছা-নির্বাসনের স্মৃতি এই সূত্রে মনে আসতেও কিছু বাধা নেই।

তাহলেও একটা কথা স্পষ্ট হওয়াই চাই ; "চোখের বালি"র কোনো চরিত্রের সঙ্গেই মহর্ষি-পরিবারের কিংবা রবীন্দ্র-পরিচিত কোনো ব্যক্তিত্বের দূরতম সাদৃশ্যও নেই, বিনোদিনী-অন্নপূর্ণার প্রসঙ্গ তো উঠতেই পারে না। উপন্যাসের ব্যক্তিত্বরাজিকে কবি তাঁর অনুভব হতে জন্ম দিয়েছেন কি করে—অনুষঙ্গ সমেত তার পরিচয় সন্ধান করা যাবে একটু পরে। এখানে কেবল ভাবতে হয়, সে-অনুভব যে-অভিজ্ঞতার ফসল, তার উৎস ছিল কবির অজান্তেই তাঁর চেনা জীবনের নিভৃতিতে।

বিহারীর জন্যে কনে দেখতে গিয়ে আশার প্রতি হঠাৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল মহেন্দ্র। উপন্যাসের,—এবং মহেন্দ্রর জীবনেরও, সে-এক দিগ্‌দর্শী মানসিক মুহূর্ত। তারই পারিপার্শ্বিকতার ছবি এঁকেছেন শিল্পী :—"তখন চৈত্রমাসের দিবসান্ত সূর্য অস্তোন্মুখ।"

'চিত্রিত চিক্কণ চীনের টালি গাঁথা' দোতলার দক্ষিণ বারান্দায় বিহারীকে নিয়ে 'আলজ্জিত ভাবে' খেতে বসেছে মহেন্দ্র। "নীচে বাগানে মালী তখন ঝারিতে করিয়া গাছে গাছে জল দিতেছিল, সেই সিক্ত মৃত্তিকার স্নিগ্ধগন্ধ বহন করিয়া দক্ষিণ বাতাস মহেন্দ্রের শুভ্রকুঞ্চিত সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে দুর্দাম করিয়া তুলিতেছিল।" বাসন্ত অনুরাগের এই প্রকৃতি মধুরিম ছবি সেই কবিমনের কথাই অনুভবে আনে,[৬] 'পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ির ভেতরের নারিকেল গাছ...ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ—সমস্ত জড়িয়ে একটা অর্ধপরিচিত প্রাণী' 'খুব ছেলেবেলা' হতে যাঁকে সঙ্গদান করে ফিরত। কিংবা "জীবনস্মৃতি"র সেই শৈশবানুভব[৭] :—'শরৎ কালের ভোর বেলায় ঘুম ভাঙলেই রোজ বাড়ির ভেতরে শুকিয়ে পড়া বাগানটির মধ্যে ছুটে যাওয়া' ; যেখানে "একটি শিশিরমাখা ঘাস পাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত।" এ-কেবল, প্রকৃতি-প্রেমের কথা নয়, এ এক বিশেষ মনোভঙ্গী, যা বাগানের গন্ধ-বিভোল! কবি-মনোভব সেই বিশেষ ভঙ্গিমাটি মহেন্দ্রের জীবন-পরিণতিরও পথনির্দেশ করেছে।

এ বিষয়ে স্বচ্ছতর সমর্থনও দুর্লভ নয় উপন্যাসে। এলাহাবাদের বর্ষা মেঘাচ্ছন্ন সেই প্রদোষমুহূর্তটি,—বিনোদিনী যখন বাসর সাজিয়ে বসে আছে বিহারীর পরিত্যক্ত কক্ষে ; দিনান্ত-কিরণখচিত যমুনাতীরে তখন "পদাবলীর বর্ষাভিসার মহেন্দ্রের মনে পড়িল।...নদীর পরপারে অন্ধকারে সেই অভিসারিণী বহুদূরে—তবু মহেন্দ্র তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার কাল নাই, তাহার বয়স নাই—সে চিরন্তন গোপবালা—কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল—সে বিনোদিনী।"

তার বছর দশেকের বেশি আগে রবীন্দ্রনাথের জানা হয়ে গিয়েছিল[৮] :—

"এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে
এখনো প্রেমের খেলা
সারা নিশি, সারা বেলা—
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটিরে"

কিংবা আরো বছর চারেক পরে লেখা 'বর্ষা-যাপন' কবিতা[৯]—

"সুর করে বার বার পড়ি বর্ষা-অভিসার—
অন্ধকার যমুনার তীর।
নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোনো বাধা
খুঁজিতেছে নিকুঞ্জকুটির।"

এমনি করে, বিশেষিত দেশ-কাল-ব্যক্তিত্বের জটিলতার ছবি গড়তে গিয়ে "চোখের বালি"র জীবনে শিল্পী 'আপন মনের মাধুরী' জড়িয়ে দিয়েছেন, যার পেছনে ছড়ানো আছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর অনুভবের বিভা!

এবার সেই গোটা জীবন-সমস্যার চরিত্রটি খুঁজে দেখা যেতে পারে ; তার পূর্বচ্ছায়া

৬। দ্র. অজিতকুমার চক্রবর্তী—"রবীন্দ্রনাথ" ১৩৬৪, (রবীন্দ্র-পত্রের উদ্ধৃতি)—পৃ. ২৫
৭। "জীবনস্মৃতি"—র. র. ১৭—পৃ. ২৭৩
৮। 'একাল ও সেকাল'—"মানসী", র. র. ২—পৃ. ১৪৯
৯। দ্র. "সোনার তরী"—র র. ৩—পৃ. ২৮

ছড়ানো বঙ্কিমের কালের ভাবনায়। বিনোদিনীর সঙ্গে রোহিণীর সাদৃশ্যের প্রসঙ্গ বহু আলোচিত। কিন্তু তারও গভীরে পৌঁছতে পারলে দেখা যাবে—এ-সমস্যা নানা দিক থেকেই বাঙালি রেনেসাঁস-এর মৌল গ্রন্থি। আর ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা ও স্বীকৃতির উদ্দীপনাই 'নবজাগরণ'-এর মুখ্য প্রেরণা ; সর্বত্র—সকল কালে। বাঙালির নবজাগরণ তার পরিবার-কেন্দ্রিত জীবনমন্থনের বৈশিষ্ট্য-সূত্রে নারী-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা কামনায় উদ্বেল হয়েছিল।[১০] রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সাধনায় তার অক্ষয় স্বাক্ষর। নারীর শিক্ষা, তার উত্তরাধিকারগত দাবি, বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ, কিংবা, এমন কি, সধবা নারীরও প্রেমের স্বাধীনতা—এই সব কিছুই নারীর স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতির উপাদান। কিন্তু যথার্থ স্বীকৃতির প্রশ্ন আরো গভীর ; ব্যাবহারিক নয় একেবারেই—সম্পূর্ণ ভাবে আন্তরিক। সমস্যার এই মৌল চরিত্র—তার 'আঁতের কথা'র অনুসন্ধানবশেই রবীন্দ্র-জীবনচিন্তনের গাঢ়তা এবং স্বাতন্ত্র্য।

স্বীকৃতির উৎস আসলে অনুকূল মনের একান্ত অনুমোদনে। মহেন্দ্র-বিহারীর গল্প যে-কালের, তখন শিক্ষিত রুচিশীল নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে নারীর সম্পর্কে আগ্রহে শালীনতার সঞ্চার ঘটেছিল ; কিন্তু পুরুষের অন্তঃকরণের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতির অনুমোদন তার গভীরে স্পন্দিত হয়ে ওঠে নি। "বিষবৃক্ষ"র দেবেন্দ্র, এমন কি "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এ গোবিন্দলালেরও আসক্তির মূলে রূপ-মোহের ইঙ্গিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ; আসলে পুরুষ-প্রকৃতির নারীদেহ-লুব্ধতার নিয়ন্ত্রণহীন আগ্রহ! "করুণা"য় করুণা কিংবা মোহিনীর ভূমিকাও একই মূল্যে মূল্যায়িত। "চোখের বালি"র বিশেষিত দেশকাল-সমাজে ঐ দেহমাত্র-সর্বস্ব লুব্ধতা হতে বাঙালি তরুণ-মনের সদ্য উত্তরণ ঘটেছে। আবার সেই ছবি মনে করি, বর্ষা-মেদুর যমুনাতীর হতে বিনোদিনীর প্রেমে উন্মত্ত মহেন্দ্র ঘরে ফিরে বাসক-সজ্জিতা বিনোদিনীকে দেখে যথার্থই যখন উন্মাদ হতে চেয়েছে, তখন বিহারী-ভাববিলসিত বিনোদিনীর কাছ হতে এসেছে রূঢ়তম প্রত্যাখ্যান। অস্থির, মহেন্দ্রর মতো অসহ্য অস্থির, তরুণের কাছে তখন যা খুশি তাই অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবু মহেন্দ্র বলে, "তুমি আমাকে ভয় কর না কেন, এখানে তোমার রক্ষক কে আছে।" বিনোদিনীর অকুণ্ঠ উত্তর—"তুমি আমার রক্ষক আছ। তোমার নিজের কাছ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিবে।" মহেন্দ্র প্রশ্ন করে, "এইটুকু শ্রদ্ধা, এইটুকু বিশ্বাস, এখনো বাকি আছে।" বিনোদিনীর থাক-না-থাক, মহেন্দ্র নিজের সম্পর্কে ঐটুকু শ্রদ্ধা, ঐটুকু বিশ্বাস কেবল নিজের জন্যেই হারিয়ে ফেলতে পারে না। তেমন হলে, কেবল বিনোদিনী নয়, স্বয়ং মহেন্দ্রকেও আত্মহত্যা করতে হত। শারীরবৃত্ত পৌরুষের পরিভাষায় এ-যদি কাপুরুষতাও হয়, মহেন্দ্রর, তথা গোটা "চোখের বালি"র জীবনের মাত্রাটি ঐ মানসিকতার তারে বাঁধা। মহেন্দ্রর ব্যক্তিত্বের আগাগোড়া সমস্যাটি হল নিজের মধ্যে তিলে তিলে নিজের প্রতি আস্থা এবং ভরসা হারিয়ে ফেলে চলার দুরপণেয় গ্রন্থি।

কিন্তু সে সমস্যা মহেন্দ্রর ব্যক্তিগত ; আপাতত আমাদের অনুসন্ধান, সমাজের ছবি—নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্মোচনে তার অগ্রগতির মাত্রাটি নিয়ে। নারীর প্রতি প্রাকৃতিক আকর্ষণের যে-পরিণতির নাম প্রেম, তারও স্তরপরম্পরা আছেই পুরুষের চেতনায়।

১০। দ্র. ভূদেব চৌধুরী—"বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা" ২য় পর্যায় (ষষ্ঠ সং)—ত্রয়োদশ অধ্যায়।

"চোখের বালি"র পটভূমিতে তাকে ঐকান্তিক দেহাশ্রয়িতার গণ্ডিরেখা পার করে দিয়েছে তার দেশকালগত মনোভঙ্গী, অথচ তাকে আত্যন্তিক স্বয়ংভর মর্যাদায় স্পষ্ট করতে পারে নি। তাই নিয়ে উপন্যাসের জীবন-সংগ্রাম।

সদ্যোবিবাহিতা বধূকে নিয়ে মহেন্দ্রর 'বাড়াবাড়ি'র প্রসঙ্গে রাজলক্ষ্মী মনে মনে ভেবেছিলেন, "কর্তারা তো আমাদেরও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন বেহায়াপনা তো তখন ছিল না।" এর পেছনে নারীর আত্মাবমাননার যে ছবিটি আছে, রাজলক্ষ্মী নিজেও সে সম্পর্কে সচেতন নন ; রাজলক্ষ্মী কেন, বিনোদিনী ছাড়া "চোখের বালি"র আর কোনো নারী-চরিত্রই নয়। নারীর যে-ভূমিকাটা বাকি সকলে মিলে স্বীকার করে নিয়েছেন, সে পুরুষের, তথা স্বামীর, ব্যবহার্যতার। আশার মধ্যে যে সন্তর্পণ বেদনা, সে-কেবল স্বামী কেন তাকে অন্যরকম ভাবে—মনের মতো করে—ব্যবহার করলেন না, তাই নিয়ে। এর বেশি দাবি করতে পারার মতো মনই গজায় নি তার মধ্যে।

তাহলেও 'ভোগ্য' শব্দটি এই নূতন বাতাবরণে আর যথোপযুক্ত নয়—অন্তত মহেন্দ্র-বিহারীর মতো ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গে। এমন কি বিনোদিনীকেও মহেন্দ্র শেষ পর্যন্ত কেবল ভোগের জন্য গ্রহণ করতে পারে নি, সে-সাধ্যই তার ছিল না। একেই মনে করেছি, রবীন্দ্র-উপন্যাসে পুরুষচরিত্রের মানবিক উত্তরণ—উন্নততর মাত্রায়। আর এই নূতন মাত্রার ওপরেই "চোখের বালি"র জীবন-সমস্যার ভিত। "চোখের বালি"র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নূতন যুগের কথা ভেবেছিলেন—'এ-যুগের কারখানা ঘরে'র কথা, এই নতূন মাত্রাতেই নূতন যুগের চরিত্র।

বিনোদিনীর উত্তপ্ত ক্রোধে নারীর দৃষ্টিকোণ হতে তার পরিচয়টি স্পষ্ট হয়েছে, একদিন সে বলেছিল, "আশাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য, আশার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্য, আশার সমস্ত সুখ সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তাহার জন্ম। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু আশাকে বিবাহ করিবেন, সেই জন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু সরলা আশার চোখের জল দেখিতে পারেন না, সেইজন্য বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।...প্রতিকূল ভাগ্য-বশত বিনোদিনী আপন প্রতিভাকে কোনো পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে জয়ী করিতে না পারিয়া জ্বলন্ত শক্তিশেল উদ্যত করিয়া সংহারমূর্তি ধরিল।"

বিনোদিনীর ছলাকলা এরপর হতে কেবল মহেন্দ্রকে নিয়ে নয়, বিহারীর প্রসঙ্গেও কখনো কখনো মায়াজাল বিস্তার করতে চেয়েছে। মহেন্দ্র যে ফাঁদে ধরা পড়েছিল, সে নারীর ভোগ্যতার আদিম করণকৌশলে গড়া ; এ ফাঁদ পেতেছে বিনোদিনী অনেকটাই স্বেচ্ছায়, প্রকৃতির হাতে পাওয়া জীব-জৈবনিক হাতিয়ারের সহযোগে। এইখানে রোহিণীর সঙ্গে বিনোদিনীর সাদৃশ্য—এইখানেই তফাতও। গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপেই ভুলেছিল, তবু রূপে ভোলাবার কথা সচেতনভাবে ভাবতে পারত না "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর রোহিণী। বিনোদিনী ভোলাবার নেশায় মেতেছিল আপন অসাধারণ রূপগুণের সচেতন সামর্থ্য নিয়ে। তার সুশিক্ষা-পরিমার্জিত ব্যক্তিত্ব, তার দেশকাল, সেই সামর্থ্যে শক্তি জুগিয়েছিল। এক সময়ে তার নেশা তার উদ্দেশ্যকেও ছাপিয়ে গিয়েছে অজান্তেই ; আত্মবিনাশের পথে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিনোদিনী তার আপন আকাঙ্ক্ষার মাত্রা-পরিচয়টি খুঁজে পেয়েছে—সে ঐ বিহারীর আন্তরিক স্বীকৃতির আলোকে। একদিন, "বিহারী আশাকে শ্রদ্ধা করে এবং

বিনোদিনীকে হালকা করিতে চায়"—এতে বিনোদিনীকে বিঁধেছিল। আরেকদিন, সেই চড়ুইভাতির দিনে, পুরুষের চিত্তের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার আনুকূল্য পেয়েছিল বিনোদিনী, সে-ও বিহারীর কাছেই। চরম মুহূর্তে মহেন্দ্রর আশ্রয় থেকে পালিয়ে এসে বিহারীর পায়ে ধরে সেধেছিল সে—একবার তাকে 'শ্রদ্ধা' করেছিল বিহারী, কিন্তু ভালোবাসাতে তার কী বাধা ছিল! আরেকদিন—অন্তিম বোঝাপড়ার মুহূর্তে মিনতিভরে বলেছিল, "আমি জানি আমার উপরে তোমার অল্প একটু শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, সেইটুকু আমার একমাত্র সম্বল করিয়া রাখিব।" ঐটুকু ঘিরে তার বাকি জীবনে পাওয়া-না-পাওয়ার অজস্র জটিলতা জট পাকিয়েছে—জট খুলেছে।

এরপরেও চূড়ান্ত মুহূর্তে বিহারীর বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিনোদিনী কেন কাশীবাসিনী হয়—কেন বিহারীও ঐ ব্যবস্থাই স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেয়, তা নিয়ে সংশয়-দ্বিধার কোনো অবকাশ থাকা উচিত নয়। তবু যে আজও পর্যন্ত এ-বিষয়ে বিতর্ক ঘোচে না, তার কারণ জীবন-চিন্তা নিয়ে মাত্রাগত বিভ্রান্তি। বিনোদিনী-বিহারীর বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে সামাজিক প্রথা সংস্কারের ওপরে বিধবা নারীর জীবন-সম্ভোগের ব্যক্তিক দাবি প্রতিষ্ঠা পেত ; কিন্তু এ-সংঘাতটা তো বাইরের নয়! 'আঁতের কথা'টি রয়েছে আরো গভীরে—ব্যক্তির স্বতন্ত্র মূল্যের বৈভব যেখানে, নারীপুরুষের পারস্পরিক 'শ্রদ্ধা'—পরস্পরের মর্যাদার মনোভব অকুণ্ঠ অনুমোদনে। রবীন্দ্রনাথ স্বাতন্ত্র্য-চেতনার ঐ মানবিক মাত্রাটিকেই "চোখের বালি"র কেন্দ্রে রেখেছেন। তাই বিহারীকে গ্রহণ করে নিজের কাছেও নিজেকে অশ্রদ্ধেয় করতে পারে না বিনোদিনী,—বিনোদিনীর সম্পর্কে বিহারীর পরিণামী ভাবনাও তাই।

মানুষের পুরো মাত্রাটিই বুঝি এখানে আভাসিত। আসলে মানুষ তো সামাজিক জীব! সমাজ-প্রতীতির বিরুদ্ধতা করে তার স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ অনমিত হতে পারে, কিন্তু তার সামগ্রিক সত্তার সার্থক অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। বিনোদিনীর সমস্যা এদিক থেকেও ছিল ব্যক্তিগত। মহেন্দ্রকে একদিন সে ভোলাতে চেয়েছিল 'পৈশাচিক ইন্দ্রজাল' বিস্তার করে ; মিথ্যাচার জেনেও ঐটেই ছিল সেদিন উন্মত্ত নেশা। নেশার ঘোর কেটে গেলে, সুস্থ মনে, ঐ জীবনটিই সে আর শ্রদ্ধার সঙ্গে সমর্পণ করতে পারে নি বিহারীকে। এ-বিড়ম্বনা মানব জীবনের অনপনেয় গ্রন্থি। কত জট এতে বিনোদিনী জেনে পাকিয়েছে, কত পেকে উঠেছে তার সামর্থ্যের এবং অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে—তাহলেও এর সবটুকু ফলই শেষ পর্যন্ত তাকেই বহন করতে হয় জীবনভোর। বিনোদিনীর সমস্যাটি সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ নিয়ে নয়—তার নিজের ভেতরকার ব্যক্তি এবং সমষ্টি-চেতনার অন্তর্ঘাতে।

বহিরঙ্গ অস্তিত্বে "চোখের বালি"তে সমাজ আসলে অনুপস্থিত। এ-গল্প ঔপনিবেশিক নগর-কলকাতার বিত্তজীবী নিঃসমাজ মানুষের প্রথম জীবনালেখ্য। মহেন্দ্র, এবং বিহারীরও পূর্বপুরুষ তাদের জন্য এমন প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করে গিয়েছিলেন, যার ফলে সারাজীবন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যথেচ্ছ নষ্ট করেও তার বিনাশের আশংকা ছিল না। ঐতিহাসিক হয়ত বলবেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবশ্যম্ভাবী ফল।

কিন্তু, সে বিষফল ; কেবল শোষিতবিত্ত দরিদ্রের পক্ষে নয়—বিত্তবানদের প্রসঙ্গেও সমতুল। ব্যক্তিত্বের যা-কিছু সম্বল, তা অন্তরে-বাইরে সম্পদ হয়ে ফলে সামাজিক প্রয়োগের অবকাশ এবং সামর্থ্যে। সমাজ-পরিধিতে পরিস্ফুট হতে না পারলে সমর্থ ব্যক্তিত্বের পরিণাম হয় সুগন্ধবহ বুনো ফুলটির মতো ; নিজের মধ্যে সে নিজে শুকিয়ে মরে। বিনোদিনী-আশা-

মহেন্দ্র-বিহারীর সমস্যাটা এমন হতোই না, আরো একরকম হতো, যদি তারা কোনো নির্দিষ্ট সমাজের সামাজিক হয়ে থাকতে পারত। বাইরের অজস্র অভিঘাতে, ভেতরের টানা-পড়েনে, দিশেবদল, রং-বদল হতোই নানা রকমের। যেমন হতে চাইছিল বিনোদিনী দ্বিতীয়বার বারাসতে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবার পরে।

মহেন্দ্র সেখানে গিয়ে না পৌঁছালেও বিনোদিনীর জীবনে নূতন গ্রন্থি পাকিয়ে যেতোই ; যাচ্ছিলও আসলে। বিহারীকে চিঠি লিখে প্রকাশ্যে ডাকে দিয়ে আসা, উত্তরের প্রত্যাশায় ঘন ঘন ডাকহরকরার উদ্বেজন—আরো সব কিছু মিলে বিনোদিনী একদিন গ্রাম-জীবনকে যেখানে ফেলে গিয়েছিল, সেখানেই ফিরে না আসতে পারার সমস্যাটা সমাজ-পটভূমিতে ছুঁচ ফোটাতে লেগেছিল। তবু, ব্যক্তি আর সমাজের দোটানায় গোটা জীবনের নক্সিকাঁথা বোনা হল না মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনী ছিটকে বেরিয়ে যেতে।

আসলে, উপন্যাস-শরীরে সামাজিক সংস্থানের ছাপ কোনো স্তরেই গাঢ় হতে পায় নি। অতিশয় দুঃখের দিনে অন্নপূর্ণা কাশী থেকে ফিরে আসতেই পুত্রস্নেহ-বিড়ম্বিতা রাজলক্ষ্মীর মন অতীতস্মৃতি-ভারাক্রান্ত হয়েছিল, "মহেন্দ্রর জন্মের পূর্বেও ঐ দুটি জা যখন বধূভাবে এই পরিবারের সমস্ত সুখদুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন—পূজায়-উৎসবে, শোকে-মৃত্যুতে উভয়ে এই সংসার রথে একত্র যাত্রা করিয়াছিলেন—তখনকার সেই ঘনিষ্ঠ সখিত্ব রাজলক্ষ্মীর হৃদয়কে আজ মুহূর্তের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।" নগর কলকাতার জীবনে ঐ 'পূজা-উৎসব' কিংবা অপরাপর যৌথ পারিবারিক কৃত্যের কোনো আভাসও উপন্যাসে ছায়া ফেলতে পারে নি, পারলে সমকালের নগরবাসী জমিদার সমাজের আদলটি চোখে পড়বার মতো হতো। মনে হয়, এখানেও ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-অনুভব গল্পালেখ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে হিন্দু জমিদারির পারিবারিক সংস্কারের কিংবদন্তীর মধ্যে বড় হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষি-পরিবার তখন অনেকটাই সমাজ-বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যের ব-দ্বীপবাসী। উপন্যাসে মহেন্দ্রর পরিবার, তথা, বিহারীর জীবনযাত্রার চরিত্রও বহুলাংশে অনুরূপ।

কিন্তু মানুষ নামক সামাজিক জীবের চেতনায় সমাজের একটা আন্তরিক মাত্রাও তো আছে। স্বতন্ত্র সামর্থ্যের তুঙ্গবিন্দুতে পৌঁছেও ব্যক্তির মন পারিপার্শ্বিক সমষ্টি-জীবনে ব্যাপ্তি এবং প্রতিষ্ঠার কামনায় ভেতরে-বাইরে বিচলিত হয় ; বস্তুত সেই ব্যাপ্তি এবং প্রতিষ্ঠার নিরিখেই তার সামগ্রিক অস্তিত্বের পরিমাপ। বিহারীর কিছুই করবার ছিল না তার আত্মবদ্ধ জীবনে, তাই সে এম্. এ. পাশ করে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়তে চায়—ওখানে এক বছর খুইয়ে আসে আবার ডাক্তারি পড়তে। মহেন্দ্রর অবস্থাও তাই—এক বছর 'ফেল' করেও ডাক্তারি পড়া নিয়ে তার কেবল যথেচ্ছ খেয়ালখুশির খেলা।

বিহারীর নিজের জন্যে কিছু করবার নেই, তাই পরকে নিয়ে তার যত উৎসাহ ; মহেন্দ্রর আবার কেবলই নিজেকে নিয়ে। এই দু-ধরনের ব্যক্তিত্বও আসলে পারিপার্শ্বিকতার চাপে গড়া। বিহারী সর্বত্রই নির্ভরযোগ্য, দায়িত্বশীল—কারণ প্রথমাবধি সবাই তার ওপরে ভরসা রেখেছে—দাবি করেছে। আস্থাভাজন হতে পেরে ক্রমে সে আস্থাযোগ্য হয়েছে, বিপদে-আপদে রাজলক্ষ্মী-বিনোদিনী-আশা সকলেরই সে আশ্রয়স্থল। অন্যপক্ষে মহেন্দ্র কোনোদিন আস্থাভাজন হবার অবকাশই পায় নি। অমেয় বিত্তশালী পরিবারে বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান সে, কেউ তার ওপরে নির্ভর করে না—সবার ওপরে তার নির্ভর, তাই নিজের কাছেও

সে নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি—ঐখানেই সে ঘরে-পরে বিড়ম্বিত। উপন্যাসের ভাষা অনুসরণ করলে, মহেন্দ্র কোনো হৃদয়ের 'শ্রদ্ধা'র অনুমোদন পায় নি—তাই তার ব্যক্তিত্ব নিজের কাছে কেবলই শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। ঐখানে বিহারী আর মহেন্দ্রর চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যের 'আঁতের কথা'।

কিন্তু দুজনের ব্যক্তিত্বে সাদৃশ্যের সূত্রও একটি আছে ; সে ঐ নিঃসমাজ জীবনের একাকিত্বের ভার। উপন্যাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে মহেন্দ্র বিহারীর সেবাব্রতে যোগ দিতে দৃঢ় সংকল্প হয়ে বলেছিল, "...যে-জীবন আমি গঠন করিয়াছি, তাহাকে লইয়া আলস্য ভরে আর উপভোগ করিবার জো নাই—কর্মের দ্বারা যদি তাহাকে টানিয়া লইয়া না চলি, তবে কোন্‌দিন সে আমাকে টানিয়া অবসাদের মধ্যে ফেলিবে। তোমার কর্মের মধ্যে আমাকে স্থান দিতেই হইবে।"

এ-অবসাদ প্রথমে চমকে দিয়েছিল বিহারীকে। মহেন্দ্রর সঙ্গে দূরত্ব অপরেরও লক্ষ্যগোচর হতেই মেডিকেল কলেজ ছেড়ে সে ঘরে এসে বসেছিল ;—'অকাজের কাজ যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয়'ও তো আর রইল না! তাই হাতের পাঁচ জোগাড় করতে হ'ল ; প্রতিবেশী গরিব ব্রাহ্মণ রাজেন্দ্র চক্রবর্তীর শিশুপুত্রকে লেখাপড়া শেখানোর খেয়াল-খেলা। খেয়াল-খেলাই ; কারণ রূঢ়তর আঘাতের স্পর্শে যখন সে পশ্চিম ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে, তখন আর ঐ দায়িত্বের কথা মনেও থাকে না। সমাজের দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধের বাঁধন ব্যক্তি-চিত্তের আত্মসংবরণের অপরিহার্য আলম্বন ; ঐ মাধ্যাকর্ষী টানটুকু কেটে গেলে যথেচ্ছ-বিহারী ব্যক্তিক ভাবালুতা আকাশ-কুসুম বিলাসে ক্লান্ত হয়েই পড়ে। সেই ক্লান্তি অপনোদনের উদ্দেশ্যে বিহারী বালিতে দুস্থ কেরানিকুলের জন্যে স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে নিজেকে গাঢ়তর সামাজিক দায়িত্বের বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্র আশা সকলেরই আত্মরক্ষার—নিজেদের টেনে নিয়ে বেড়াবার, ঐ একটিমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠেছে। নিঃসমাজ মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের পক্ষে ভেতর হতে আত্ম-উন্মোচনের মর্মান্তিক চেষ্টা!

এইখানে ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টির সহজাত তীক্ষ্ণতাটুকু লক্ষ করতেই হয়। রেনেসাঁসের বহু উচ্চারিত চিৎপ্রকর্ষের গভীরে বৃহত্তর জীবন-মূল-বিচ্ছিন্নতার যে ভয়াবহ আশঙ্কাটি আত্মগোপন করেছিল, মহেন্দ্র-বিহারীর জীবন ঘিরে তারই ছায়ারূপ কবি আভাসিত করে তুলেছেন হয়ত সচেতন মনের অজ্ঞাতেই। "চতুরঙ্গ"র শচীশ-শ্রীবিলাস যে বিচ্ছিন্নতাবোধে নিয়ত আক্রান্ত, তার উৎসমূল "চোখের বালি"র জীবনেই সহজে উন্মেষিত।

"চোখের বালি"র জীবনচিত্রটিকে খুঁটিয়ে দেখা গেল বিশেষিত দেশকালের প্রেক্ষিতে—যে-দেশকাল গল্পের পটভূমি হতে শিল্পীর অভিজ্ঞতা-অনুভবের যোগাযোগে নিটোল-গ্রন্থিত। তাহলেও উপন্যাস-দেহে সেই জীবনরহস্যটি আরো একটু তলিয়ে দেখা যেতে পারে—যাকে বলি শিল্পের সৌন্দর্য। আসলে বৃহত্তর জীবনের গহন হতে সে শিল্পীর নিজস্ব সহজ আবিষ্কার। "চোখের বালি"র জগৎটাও 'প্রেমের ফাঁদপাতা ভুবন' অনেকাংশে। নরনারীর প্রণয়-রহস্য রবীন্দ্র-সৃজনীকল্পনার এক পরম প্রেরণা ছিল—"শেষের কবিতা" হতে "চার অধ্যায়" অবধি উপন্যাসেও তার বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা। "চোখের বালি"তে সেই শিল্পি-মনোভাবনার প্রথম সফল অঙ্কুরণ। আশা-বিনোদিনী-মহেন্দ্রর প্রণয়-বৃত্তটি হয়ত অপেক্ষাকৃত স্থূল,—মুঠো করে ধরবার মতো ; কিন্তু বিহারীর আশা-প্রীতি হতে বিনোদিনী-বরণ পর্যন্ত উত্তরণের রহস্যটি কবির নিপুণ হাতের গ্রন্থন।

ঐ প্রণয়-ভাবনার সূত্রেই রবীন্দ্র-প্রেমচৈতন্যের চরিত্রটিও আবার চোখে পড়ে,—"সংসারের কঠিন কর্তব্য হইতে প্রেমকে ফুলের মতো ছিঁড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইলে, তাহা কেবল আপনার রসে আপনাকে সজীব রাখিতে পারে না, তাহা ক্রমেই বিমর্ষ ও বিকৃত হইয়া আসে।"—"চোখের বালি"তে এটুকু ঔপন্যাসিকের প্রতিবেদন ; রাজলক্ষ্মীর বারাসত চলে যাবার পরে অন্নপূর্ণাও যেদিন বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলেন, আশার সেদিনের মনোভাবনা ব্যক্ত করতে। দুঃখের অভিঘাতে আরো পরে একদিন আশা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল, যেদিন পারিবারিক কর্তব্য পালনের কঠিন ভূমিকাটি সে আপন সামর্থ্যে অধিকার করতে পেরেছিল। 'স্ত্রী'র পদবি থেকে 'নারী'র স্বয়ংভর ভূমিকায় সেদিন তার সাবলীল উত্তরণ, পুরুষ-ভোগ্য—পুরুষ-বিলগ্নতার গণ্ডী পেরিয়েও যা পুরুষ-বিবর্জিত নয়।

অজস্র ভাঙাচোরার মধ্যেও সমগ্র জীবন-চরিত্রটিই রবীন্দ্রনাথের অনুধ্যান-সাধিত। প্রচলিত পরিভাষায় ঐটুকু 'ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন' ; খণ্ডবিচ্ছিন্নতায় বিভঙ্গিত অব্যবহিত জীবন-প্রবাহের পরিণামী স্বরূপটির সন্ধান! এ-ও বিশেষার্থে কবির মনোভব—তাঁর বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা-অনুভবের মন্থনে গড়া। উনিশ শতকীয় জীবন-স্বপ্নের মোহাঞ্জনটুকু তখনো মনে ধরা—যার কাব্যিক প্রতিবেদন রয়েছে "চিত্রা"র 'কল্যাণী' কবিতায় :—

"বিরল তোমার ভবনখানি
পুষ্পকানন মাঝে,
হে কল্যাণি, নিত্য আছ
আপন গৃহকাজে।"

অন্নপূর্ণার চরিত্র সেই স্বপ্ন-সুরভি-মণ্ডিত ; তাঁর কাছ হতে আশা একদিন পাতিব্রত্যের পাঠ নিতে চেষ্টা করেছিল। কিংবা বিহারী একদিন উৎফুল্ল হয়েছিল বিনোদিনীর মধ্যে একটি ত্যাগব্রতমহিম গৃহলক্ষ্মীর সম্ভাবনা অনুমান করে। তবু শেষ পর্যন্ত কবির কল্পনা আর জীবনের ঘটনায় জোড় মেলে না! "চোখের বালি" উপন্যাসের শেষে ঘর ভেঙেই গেছে—রাজলক্ষ্মী লোকান্তরিতা, অন্নপূর্ণা-বিনোদিনী কাশীতে—আশা-মহেন্দ্র বিহারীর সেবাপ্রতিষ্ঠানে। ঘরভাঙা জীবন-পরিণামে যেখানে পথিকবৃত্ত, সেখানেও অন্নপূর্ণার সন্তর্পণ কল্যাণী মূর্তিটি বিনোদিনীর অন্তিম বিদায়-সম্ভাষণের অন্তরাল হতেও এক নম্র সম্ভ্রমের সঞ্চার করে। নিদাঘে-বর্ষায় বিমর্দিত মিশ্র-জটিল এই সব গ্রন্থির জট খুলে-খুলেই "চোখের বালি"র অ-পূর্ব উপন্যাস-রূপের ক্রমিক উদ্ভাস।

(৩)

"চোখের বালি"র পরে "নৌকাডুবি"তে এসে প্রকাশের প্রকরণ বুঝি আবার বিপরীতমুখী হল। বয়সে "নৌকাডুবি" "চোখের বালি"র চেয়ে মাস ছয়েকের ছোট। ১৩০৯-এর কার্তিক মাসে নবপর্যায় "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় "চোখের বালি"র প্রকাশ শেষ হয়েছিল ; ঐ পত্রিকারই ১৩১০ বৈশাখ সংখ্যা হতে "নৌকাডুবি"র সূচনা ; চলেছিল ১৩১২-র আষাঢ় অবধি। তবু মনে হয়, এ-যেন কোনো পূর্ব যুগান্তরের ভাবনা-সম্ভব।

কারণটা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বুঝিয়ে বলতে চেয়েছেন,[১১] "...ভিতরের দিকে গল্পের তাড়া

১১। দ্র. "নৌকাডুবি" : 'সূচনা'—র. র. ৫, পৃ. ১৬৫

ছিল না। গল্পলেখার পেয়াদা যখন দরজা ছাড়ে না, তখন দায়ে পড়ে ভাবতে হল, কী লিখি।"—আসলে নবপর্যায় "বঙ্গদর্শন"-এর গহ্বর পোরাতেই "নৌকাডুবি"র জন্ম। সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাসই অন্তত লেখা হত না সাময়িক পত্রের তাড়া না থাকলে। কিন্তু "নৌকাডুবি"র মূলে ঐ তাগিদই বুঝি একমাত্র, একান্ত হয়েছিল। তাছাড়া, আরো একটি খবর মনে রাখবার মতো,—১৩০৯-এর অগ্রহায়ণে মৃণালিনী দেবীর তিরোধান ; আর জীবনীকার জানিয়েছেন,[১২] যক্ষ্মাপীড়িতা মধ্যমা কন্যা রেণুকার হাওয়া বদলের জন্যে হাজারিবাগ পৌঁছে ঐ বছরেরই শেষে 'নৌকাডুবি উপন্যাসের সূত্রপাত' করেছিলেন কবি। অনেক উদ্বাস্ততার অন্তে ১৩১০-এর আশ্বিনে রেণুকাও লোকান্তরিতা হন।

অন্যপক্ষে, আগেও দেখেছি, উপন্যাসের সফল প্রকাশ জীবনের একটি বৃহত্তর প্রচ্ছদের অপেক্ষা রাখেই, কেউ কেউ যাকে বলেছেন 'মহাকাব্যিক'। আর আলংকারিক সংস্কারের বাধ্যবাধকতা ছাড়িয়ে গিয়েও ভাবতে বাধা নেই, স্বাতন্ত্র্য-উন্মুখ ব্যক্তি-মানুষ যেখানে আপন সমষ্টিগত প্রেক্ষিতের সঙ্গে অনবরত দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিক সত্তারই উন্মোচন-প্রত্যাশী হয়ে ফেরে, 'আধুনিক' জীবন-বিকাশের মহাকাব্যোচিত বাতাবরণ সেইখানেই।[১৩] "গোরা"কে পণ্ডিতেরা অনেকে বলেছেন 'মহাকাব্যধর্মী' উপন্যাস ; সে এক পৃথক প্রসঙ্গ—যথাস্থানে তার আলোচনা হবে। কিন্তু পাত্রপাত্রীর জীবন-কথা পরিপার্শ্বগত জীবনযাত্রার ব্যাপক ওঠাপড়ার সঙ্গে যে-কোনো ভাবে অন্বিত হয়ে না পড়লে উপন্যাসের গল্প তার ঔপন্যাসিক মাত্রাটিই অধিগত করতে পারে না। "বিষবৃক্ষ" প্রধানত নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর জীবন-সমস্যার আখ্যায়িকা, তাহলেও সমকালের উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি-জীবনের অন্তর্লগ্ন সাধারণ সংকটের একটি চিত্রও তার ভেতর হতে সাড়া দিয়ে ওঠে—তাই নিয়ে "বিষবৃক্ষ"র ঔপন্যাসিক চরিত্র, ব্যষ্টির জীবনমূল হতে সমষ্টি-জীবনের টানা-পড়েনের সঙ্গে যেখানে তার নাড়ির টান। "চোখের বালির"র সম্পর্কেও একই কথা—সদ্য তার পরিচয় সন্ধান করে দেখা গেছে।

"নৌকাডুবি"তে কিন্তু তেমনটি ঘটে নি। শিল্পীর অনুভাবিত কোনো নির্দিষ্ট জীবন-প্রচ্ছদের গভীরে উপন্যাস-কথা তার সাবলীল যাত্রা-পথটি খুঁজে পায় নি। বরং তাঁর মনোগত এক বিশেষ ব্যক্তিক কৌতূহল ও অভিপ্রায়ের উত্তর সন্ধান করতেই গল্প যেন ধীরে ধীরে অঙ্গ ধরেছে ; তারও অবয়বগত আনুপূর্বিকতা উপন্যাসের কার্যকারণ-পরম্পরাসূত্রে স্বচ্ছ হতে পারে নি কখনোই।

রহস্যটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই ব্যক্ত করে বলেছেন,[১৪] "স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে সংস্কার আমাদের দেশের মেয়েদের মনে আছে, তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্‌কারের সঙ্গে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়।"—প্রয়োজনও নেই তেমন উত্তরের। আসলে জীবনের সকল সমস্যাই ব্যক্তিগত ; আর ব্যক্তি যেহেতু সামাজিক সত্তাও, তার সহজ প্রকাশের গভীরে পরিপার্শ্বগত জীবনের বিক্ষেপ এমন একটি মাত্রা যোজনা করে, 'সর্বজনীন' না হয়েও যা

১২। দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : "রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী"-পৃ. ৪৫
১৩। দ্র. Ralph Fox—"Novel and 'the people", P. 26-27
১৪। "নৌকাডুবি"—"সূচনা"-র. র ৫—পৃ. ১৬৫

সর্বজন-সংবেদী হতে সক্ষম। মনে হয়, "নৌকাডুবি"তে জীবনের সেই সামাজিক মাত্রাটি শিল্পীর অবধান-সীমাতেই এসে পৌঁছোতে পারে নি। এই প্রসঙ্গেই সমকালীন রবীন্দ্র-মনের ব্যক্তিগত বিপর্যয়-স্রস্ততার ইতিহাসটুকু স্মরণীয়।

"নৌকাডুবি" সম্পর্কে ওপরের কবি-ভাবনা মূল উপন্যাস রচনার প্রায় ৩৭ বছর পরেকার। তাহলেও, একথা মানতেই হয়, গোটা কাহিনীর উদ্ভব শিল্পি-মনের ঐ তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্রে রেখেই ; অনেকটা যেমন ঘটেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা"য়। আর "কপালকুণ্ডলা"র মতোই "নৌকাডুবি"র মূল প্রকল্পেই বিভ্রান্তি রয়েছে। নারীপুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কে প্রেম বনাম পাতিব্রত্য সংস্কারের সমস্যাটি "চোখের বালি"তেই কৌতূহল জাগিয়েছিল ; আর 'পতিব্রতা'র স্নিগ্ধ রূপটি যে তখন হতেই কবির স্বপ্নকে দোলা দিয়েছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু উপন্যাসের দাবি সেদিন কবি-কল্পনার শেষ রক্ষা করতে দেয় নি। কাশীতে অন্নপূর্ণার কাছে স্বামিভক্তির যে-পাঠ আশা সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল, যে-পথের প্রতি প্রথম হতেই তার লুব্ধ অভিলাষ, ব্যাবহারিক জীবনে তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে বাধা পেয়েছে সে পদে পদেই। উপন্যাসের শেষে আশা পূর্ণ বিকশিত হয়েছে গৃহিণী নারীর ভূমিকায়, 'পতিব্রতা'র প্রসঙ্গ সেখানে অবান্তর। তবু কবির স্বপ্ন বুঝি 'নাহি মানে পরাভব'। আর এই কারণেই "নৌকাডুবি"তে ঔপন্যাসিক সমস্যার বাস্তবিক চরিত্রটিই উপেক্ষিত হয়ে পড়েছে—বস্তুজীবন-প্রচ্ছদকে আয়ত্ত করার কোনো চেষ্টা হয় নি বলেই।

আপাতদৃষ্টিতে "নৌকাডুবি"র ঘটনাকাল শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে "চোখের বালি"র উত্তরভূমিতে। "চোখের বালি"তে সমৃদ্ধ হিন্দু পরিবারের নৈমিত্তিক আচার-উৎসবে শিথিলতা জমে উঠলেও ব্রাহ্মসমাজের উদীয়মানতার চাপ তার ওপরে প্রতিফলিত হয় নি। "নৌকাডুবি"তে হিন্দু সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ জমিদারপুত্র রমেশ কলকাতায় ব্রাহ্ম-সংস্কার-সম্পৃক্ত হতেই সমস্যার প্রথম জটটি পাকিয়েছিল। এ-যদি কাকতালীয়ও হয়, তবু ভুলবার উপায় নেই—অজ পাড়াগাঁয়ে মামার সংসারে পরগাছার মতো বেড়ে-ওঠা কমলাও লিখতে-পড়তে পারার একটা অনায়াস অধিকার আয়ত্ত করেছিল। উপন্যাসের প্রথম দুর্মোচ্য গ্রন্থিটি গড়া হয়েছে একের পর এক রমেশের কুশলী প্রশ্নের জবাবে সরলা কমলার সাবলীল আত্মপরিচয়-লিখনে। কিন্তু উপন্যাস-কথায় এসব তথ্যের প্রভাব অনিবার্য নয়—বাইরে থেকে সাজানো ঘটনাধারার স্ববিরোধী টানা-পড়েনে আসল সমস্যাটিই থেকে গেছে অমূল-কল্পনা হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ দাবি করেছেন,[১৫] "একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ।" কিন্তু মনের বিকাশও তো পারিপার্শ্বিক জীবন-ঘটনার সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রেই! সে হিসেব খুঁজলে দেখি, নালিনাক্ষকে তার বন্ধু ভূপেন বলেছিল, বিয়ের সময়ে কমলার বয়স ছিল 'অন্তত চৌদ্দ'। আর ঝটিকাক্রান্ত নদীতীরে রমেশ-কমলার প্রথম সাক্ষাৎকারের ছবিটি আঁকতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "...তখন চন্দ্র অস্ত গেছে। অন্ধকারের মধ্য দিয়া এই নির্জন ধরাখণ্ড অদ্ভুত স্বপ্নের মতো বোধ হইল।...তখন রমেশ বালিকার ভয়শীতল কোমল ক্ষুদ্র দুইটি হাত দুই হাতে তুলিয়া লইয়া বধূকে আপনার দিকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিল। শঙ্কিতা বালিকা কোনো বাধা দিল না।

১৫। তদেব।

মানুষকে কাছে অনুভব করিবার জন্য সে তখন ব্যাকুল। অটল অন্ধকারের মধ্যে নিশ্বাস-স্পন্দিত রমেশের বক্ষপটে আশ্রয় লাভ করিয়া সে আরাম বোধ করিল। তখন তাহার লজ্জা করিবার সময় নহে। রমেশের দুই বাহুর মধ্যে সে আপনি নিবিড় আগ্রহের সহিত আপনার স্থান করিয়া লইল।"

লজ্জা-ভারমুক্ত সে বাহুবন্ধন বাহুর সীমাতেই কি থেমেছিল সেই দুরন্ত নিশীথে!—মনে রাখতেই হয়, রমেশের 'বক্ষপট' তখন 'নিশ্বাসস্পন্দিত' হয়ে চলেছিল ; আর 'বালিকা' কমলাও ছিল 'অন্তত চৌদ্দ' বছরের কিশোরী! উপন্যাসের বিন্যাস-কুশলতা সম্পর্কে সংশয়ের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন নি কবি, বিশেষ দাবি করেছেন 'বর্ণনায় এবং বেদনায় কবিত্বের স্পর্শ' জাগিয়ে তোলার![১৬] সদ্য-উদ্ধৃত বর্ণনায় সেই কবিত্বের স্পর্শ স্পষ্টতর হতে দেখি,—"প্রত্যূষের শুকতারা যখন অস্ত যায়-যায়, পূর্বদিকের নীল নদীরেখার উপরে প্রথমে আকাশ যখন পাণ্ডুবর্ণ ও ক্রমশ রক্তিম হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল নিদ্রাবিহ্বল রমেশ বালির উপরে শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার বুকের কাছে বাহুতে মাথা রাখিয়া নববধূ সুগভীর নিদ্রায় মগ্ন। অবশেষে প্রভাতের মৃদু রৌদ্র যখন উভয়ের চক্ষুপুট স্পর্শ করিল, তখন উভয়ে শশব্যস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল।"

কিন্তু অমন নিপুণ কবিতা-কণাবিচ্ছুরণের পরেও উপন্যাসে জীবনের প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রভাত আলো ফুটবারও অনেক আগে অমন অসাধারণ নিবিড় যুগল শয্যায় কমলার মুদ্রিত চক্ষুপুটে আরো কোনো শিহর স্পর্শ সঞ্চারিত কি হয় নি! তারপরে,—অন্তত পূর্ণ তিনটি মাস দাম্পত্যজীবন যাপনের শেষে রমেশ যখন হঠাৎ আবিষ্কার করল, কমলা পরস্ত্রী, তখনই তাকে নিয়ে তড়িঘড়ি কলকাতা চলে এসে প্রথমে সচকিত সমস্যা-বোধের টানে তার ভাবনা হল—"কমলাকে এখন তো এক শয্যায় আর রাখিতে পারি না।"—কিন্তু শয্যা বিচ্ছিন্ন করে নিলেই পরিপূর্ণ অন্তত ৯০টি রাত্রির একত্র শয়নের সমস্ত ইতিহাস কি স্লেটের লিখনের মতোই মুছে নিঃশেষ হয়ে যায়?—যেখানে এক শয্যার অংশীদার প্রতিরাত্রে ছিল একটি 'অন্তত চৌদ্দ' বছরের নবীনা কিশোরী, আর একটি উদ্দীপ্ত-যৌবন তরুণ! এ সংকট কেবল নরনারীর শারীরবৃত্তেই বাঁধা পড়ে নেই—ঐ ৯০টি রাত্রি ব্যেপে কত রহস্যের উন্মোচন-সঙ্কুচন, রাগ-অনুরাগের উত্থান-পতন, নিশান্তিক ৯০টি দিবস ভরে যার নব নব বীচিবিভঙ্গিত আত্ম উৎসার! 'ভালোবাসা' যদি 'একের মধ্যে অপরের আত্ম অভিব্যক্তি' হয়, নরনারীর দেহমনের নিরন্তর সংযোগ-সঞ্চালনেই তো তার চৈতন্যোদ্ভাস! কেবল 'শয্যা' পৃথক্ করে নিয়েই জীবনের সেই চূড়ান্ত সংকটমোচনের কল্পনা রবীন্দ্রনাথ কেমন করে করেছিলেন, ভেবে বিস্মিত হতে হয়!

আর কমলার দশা কত অবর্ণনীয় জটিল! যেদিন সে হঠাৎ আবিষ্কার করে রমেশ তার কেউ নয়, তৎক্ষণাৎ-ই তো তার সহস্র বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হয়ে যাবার কথা—পাতিব্রত্য-সংস্কারান্ধ বেচারি দুর্বলা কিশোরী! গঙ্গায় ডুবে মরা ছাড়া তার আর কি উপায় ছিল—তাতেও শরীরের দাহ এবং গ্লানি কী ঘুচবার! অথচ গঙ্গার পাড় বেয়ে বেয়ে সন্তর্পণে সে হেঁটে চলে বৈধ 'পতিদেবতা'র সন্ধানে! সাক্ষাৎ মিললেও কমলা কী 'তাঁকে' দিতে পারত—উচ্ছিষ্ট দেহপাত্রে ভরা ভক্তির অঞ্জলিই নয় কী? তাই কি দেওয়া যায়!

১৬। তদেব—পৃ. ১৬৬

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মনোধর্মের পার্থক্য আছেই,—আর তাইতেই একই ঘটনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিভেদে হতে পারে বিচিত্র-মুখ। কিন্তু কমলার মধ্যে যে মনের সঞ্চার শিল্পী ঘটিয়েছেন, সে তো ঐ পতিদেবতা-চরণলগ্না দাসীটি! অনায়াসে হেমনলিনীর হাতে আপন স্বামীকে সঁপে দিয়ে ঐ সংসারেই চিরদিনের দাসী হয়ে থাকবার স্বপ্ন কমলা দেখেছে। তার পক্ষে বহির্ঘটনা-প্রক্ষিপ্ত এই সংকটভার সইবার কোনো উপায়ই নেই। আসলে এ-সমস্যা হতে পারত "নৌকাডুবি"র রচনাকাল হতে অন্তত আরো দুই দশক পরেকার, "কল্লোল"-ভাবিত শিল্পিকুল যে-ঢেউভাঙা ঘোলাটে জলে জীবনের রক্তমাংসল জটিলতার স্বাদ সংগ্রহ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। ভেবে বিস্মিত হতে হয়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'নষ্টনীড়' ভেদ করে 'ঠান্‌দি' গল্পের খসড়া গড়েছিলেন, "নৌকাডুবি"র অমন জ্বলজ্যান্ত অসংলগ্নতা কেন কারো চোখে পড়ল না!

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সমস্যার আসল গ্রন্থিটিকে জেনে শুনে এড়িয়ে গেছেন বলে মনে হয় না—ওদিকে তাঁর দৃষ্টিই হয়ত পড়তে পায় নি। বস্তুত গোটা গল্প জুড়ে ঔপন্যাসিকের স্থিতিস্থাপকতাগ্রহী সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটিরই যেন অভাব ঘটেছিল ; আসলে 'ভিতরের দিকে গল্পের তাড়া'ই তো ছিল না। তারই ফলে গল্পের গাঁথুনিতে অসংলগ্নতা প্রায় আদ্যন্ত। বিস্তৃত আলোচনা নিরর্থক ; কেবল কবির অনবধানজনিত বিন্যাস-স্বাতন্ত্র্যের আভাস দিতেই দুয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপন্যাসের কাহিনীর প্রধান দায়িত্ব বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার ; বাইরের ঘটনা আর চরিত্রের ভেতরকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অন্তর্নিহিত পরম্পরা ও সংগতির সূত্রটুকু অক্ষুণ্ণ রাখতে পারার দায় তাতে সর্বাধিক। এ-সব দিক থেকে "নৌকাডুবি"র গাঁথুনি দুর্বল।

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, দীর্ঘ তিন মাস দাম্পত্য জীবন যাপনের আগে একবারও কি রমেশ কমলাকে আর কখনো 'সুশীলা' বলে ডাকে নি, কিংবা ডাকবার প্রয়োজন ঘটে নি তার! তা-ও যদি না হয়, কমলাকে নিয়ে বাড়ি ফিরেই তো রমেশ জেনেছিল—তার পিতা এবং শাশুড়ি নিখোঁজ! এ-নিয়ে অনেক খোঁজা-খুঁজি হয়েছে—শেষ পর্যন্ত তাদের হদিশ মেলে নি। কিন্তু নববধূর মাতৃবিয়োগ উপলক্ষে অত বড় জমিদার বাড়িতে কেউ কি তাকে একবার সান্ত্বনা জানাতেও আসে নি ; কিংবা রমেশ তখন কি ভাবে নববধূর সম্মুখীন হয়েছিল! অন্তত লোকমুখের আলোচনা সূত্রেও রমেশের শাশুড়ি-বিয়োগের কাহিনী নিশ্চয়ই কমলার কর্ণগত হতে পারত। এ-বিষয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালনের দায়ও কমলার ছিল। আর তাতেই তার যথার্থ পরিচয় আরো আগেই প্রকাশিত হয়ে যেতোই। তার ফলে নদীতীরে নবদম্পতির প্রথম মিলনান্তিক সমস্যার চরিত্র অবশ্যই বদল হত না, কিন্তু তার আকার-প্রকারগত পার্থক্য ঘটতই।

অন্যপক্ষে, হেমনলিনী-নলিনাক্ষ সংঘটনের উপলক্ষ্যে ঔপন্যাসিক তাঁর বিধাতার ভূমিকাটিকে বড় বেশি ব্যবহার করেছেন। মা'র রক্ষণশীল মনের বেদনাকে আশ্রয় দিতে যে হিন্দুসংস্কারে পুনরাশ্রিত হয়েছিল, এমন কি সেই সংস্কার তথা মাকে খুশি করার আগ্রহ বশে কমলার মতো মেয়েকে বিবাহ করার ঝুঁকিও যে অনায়াসে নিয়েছিল, হঠাৎ একবার ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করবার আহ্বানে সেই নলিনাক্ষ আবার নূতন ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কোন্ কার্যকারণসূত্রে?—সেও ঐ একবারের জন্যই!

হেমনলিনীর ব্রাহ্ম পিতা অন্নদাবাবু সব জেনেশুনেও যে-ভাবে মেয়েকে নিষ্ঠাবতী হিন্দু

শাশুড়ির ঘরে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন, তাতে তাঁরও চিত্তবৃত্তির দুর্বলতার দিকটিই প্রকাশিত হয় ; অনেকটা যেন শরৎচন্দ্রের পরবর্তিকালীন উপন্যাস "গৃহদাহ"র কেদারবাবুর মতো। অন্যপক্ষে অক্ষয় চরিত্রে "গোরা"র পানুবাবুর পূর্বাভাসই অঙ্কিত হল না কী? ব্রাহ্ম আন্দোলন শিক্ষিত শহুরে বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসে উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ; কিন্তু রবীন্দ্র-উপন্যাসে—"নৌকাডুবি" আর "গোরা"তে তার দুর্বলতার দিকটিই বেশি পরিস্ফুট। ধর্মচেতনা সম্প্রদায়-বোধে ভারাক্রান্ত হলে তার যে অবস্থা ঘটতে পারে, হয়ত তাই নিয়ে কবিভাবনা এসব ক্ষেত্রে বেশি উদ্বেজিত হয়েছিল।

সবচেয়ে বড় শৈথিল্য চোখে পড়ে গল্পের পরিণতিতে। রমেশ বারে বারেই নলিনাক্ষর কাছে কমলার পরিচয় প্রকাশ করতে চেয়েছে ; তাতে বাধা দিয়েছে গাজিপুরের 'চক্রবর্তী খুড়ো' স্বয়ং ; নিজেও সে নানা কৌশলে কমলার পরিচয় গোপন করেছে; অথচ আরো আগে ঐ পরিচয় প্রকাশ পেলে কমলার কোনো ক্ষতি ঘটতে পারত—এমন সম্ভাবনা উপন্যাস-কথায় কোথাও আভাসিত হতে পারে নি। বরং গল্প শেষ হতে পারত অনেক আগে। এ-যেন যে-গল্প জমল না, তার কৌতূহল—সাস্‌পেন্সটুকু—ঘুরিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখবার এক শিথিল দুর্বল চেষ্টা ; বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা"র পরিণতিতে যেমন দেখি। "ইন্দিরা" লঘু গল্প, কিন্তু "নৌকাডুবি" তা নয়।

অতসব সত্ত্বেও "নৌকাডুবি" বাংলা উপন্যাসের জগতে প্রত্যাখ্যাত হতে পারে নি ; কিংবা আপন রচনার বিচারে স্বভাবত নির্মম রবীন্দ্রনাথও তাকে বর্জন করেন নি একেবারেই। মনে হয়, তার কারণ—উপন্যাসের দুর্বলতাকে কবিত্বের সৌরভে ভরতে চেয়েছেন শিল্পী। 'সূচনা'য় তাঁর স্বীকৃতিও ইঙ্গিতগর্ভ হয়ে আছে। আর সে কবিত্ব, 'বর্ণনা'য় যত, তার চেয়েও বেশি কবিমনের ব্যক্তিগত 'বেদনা'য় সঞ্চারিত। "নৌকাডুবি"র মনোভিরাম সংঘটনটি সূচিত হয়েছে যখন হতে রমেশ-কমলার জাহাজ-যাত্রার শুরু। আর তখন থেকেই গল্প-কৌতূহল বিশেষভাবে কমলা-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ওখানেই 'নানা উপলক্ষে' "গৃহিণীপনার সমস্ত ভারই আপনা হইতেই কমলার হাতে গিয়া পড়িতেছে" দেখে রমেশ চিন্তিত হয়েছিল। আসলে পতিব্রতা গৃহিণীর যে-মধুর অভিজ্ঞতা রবীন্দ্র-ব্যক্তিজীবন-যাত্রার অন্তরঙ্গ সহচর হয়েছিল—কবি-পত্নীর তিরোধানের শূন্যভূমিতে তারই এতাবৎ অচেনা, কিংবা অল্পচেনা, মধুরিমাভরে কবি-চেতনা ভেতরে ভেতরে মথিত হতে আরম্ভ করেছিল। তাই গল্পের জোড় মেলানোর চেয়ে মনের হারানিধি পাবার লোভই হয়েছিল বুঝি আন্তরিক!

স্বজনহীন বালক উমেশ, প্রৌঢ় চক্রবর্তী খুড়ো, গাজিপুরে চক্রবর্তী-পরিবারের স্বজনেরা—সবাই মুগ্ধ বশীভূত হয়েছেন কমলার স্নিগ্ধ-সহজ গৃহিণীপনার মাধুর্যে। উপন্যাসশেষে চক্রবর্তীকে ক্ষেমংকরী বলেছিলেন, "এ বাড়ির রান্নাঘরে ভাঁড়ার-ঘরে এতদিন আমার শাসনই একমাত্র প্রবল ছিল, এখন আমি সেখানে কেহই নই। চাকর-বাকররাও আমাকে আর গৃহিণী বলিয়া গণ্যই করে না। কেমন করিয়া আমার এমন অবস্থাটা হইল, তাহা আমি টেরও পাইলাম না।"—এর সবটুকুই গৃহিণী মৃণালিনীর জীবন-সম্ভব অভিজ্ঞতার স্মৃতিমন্থিত ভাব-নির্যাস! গাজিপুর-প্রসঙ্গও একই স্মরণ-সূত্রে জড়িত। এখানেই 'গৃহিণী' মৃণালিনীর প্রথম আত্মপ্রকাশ নিজের মধ্যে—রবীন্দ্র-জীবনেও। ১২৯৫ সালের বৈশাখ থেকে শ্রাবণ অবধি জীবনের প্রথম স্বাধীন সংসার পেতেছিলেন কবি এখানে মৃণালিনীকে নিয়ে—একমাত্র তৃতীয় সঙ্গিনী ছিলেন শিশুকন্যা বেলা—মাধুরীলতা। তার

অনুভব-সুরভি ছড়ানো আছে "মানসী"র একগুচ্ছ কবিতায়।

গৃহিণী মৃণালিনীর মাধ্যমে রবীন্দ্র-ব্যক্তিজীবনের যে উত্তরণ ঘটেছিল, তার বেদনা-সম্ভব স্বীকৃতি রয়েছে "স্মরণ"-এর নানা কবিতায়। গাজিপুরের জীবনে প্রথম যাকে আবিষ্কার করা গিয়েছিল—প্রায় ২১ বছর পরে সেই গার্হস্থ্যমাধুর্যের আশ্রয়চ্যুত কবিমনোরথ কবিত্ব-রথে ভর করে আবার পেয়ে-হারানোর গল্প কুড়িয়ে নিল ঐ গাজিপুরের মাটিতেই বুঝি!

অতিকল্পনার বোঝা বাড়ানো নিরর্থক, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধানের সূত্রেও একটি সিদ্ধান্ত স্বীকৃতি পেতেই পারে—"নৌকাডুবি" উপন্যাস দেশকাল-ব্যক্তিত্বের বাঁধনছুট মনগড়া কাহিনীর মালা,—বাইরের ঘটনার ধাক্কায় ঠেলে এগিয়েছে; অন্তর্নিহিত গল্পকাল কিংবা রচনাকালের বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটির সঙ্গে আখ্যায়িকার যোগ ঘটে নি। সব মিলিয়ে তাই এ-লেখার উপন্যাসগুণ 'বৃন্তহীন পুষ্প'র মতোই অমূলধন হয়ে আছে। তাহলেও, সমকালীন কবিচিত্তের ব্যক্তিক আর্তি তাঁর জীবন-ভাবনাকে যেমন অন্তর্বদ্ধতার বাঁধনমুক্ত হতে দেয় নি, তেমনি ঐ 'ব্যক্তি-বেদনা'র প্রচ্ছন্ন নির্যাসটুকু গল্পের অংশবিশেষে 'অবাস্তব-মনোহারিতা'র সুরভি সঞ্চার করেছিল। ঔপন্যাসিক সামর্থ্যে দুর্বল রচনাটি ঐ সূত্রে এক স্বতন্ত্র কাব্যিক মাত্রা আয়ত্ত করেছে; কবিও সম্ভবত এই একমাত্র দাবি উপস্থিত করতে চেয়েছেন "নৌকাডুবি"র 'সূচনা'য়।

(৪)

"নৌকাডুবি"র পরে "গোরা"র রচনাকালের ব্যবধান যত, দুয়ের চারিত্রিক দূরত্ব সে-তুলনায় অপার। নবপর্যায় "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় "নৌকাডুবি"র প্রকাশ শেষ হয়েছিল ১৩১২-র আষাঢ় মাসে; "প্রবাসী"তে "গোরা" ছাপতে শুরু হয় ১৩১৪-র বৈশাখে—শেষ হতে লেগেছিল ১৩১৬-র ফাল্গুন অবধি। সাময়িক পত্রের তাগাদা এবারেও ছিল অব্যবহিত প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন[১৭] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিনাশর্তে পাওয়া 'দক্ষিণা'র অভিঘাতেই নতুন উপন্যাস লিখতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাহলেও বুঝি, মনের গভীরে সমুচিত প্রস্তুতির আনুকূল্যও ছিল সেদিন স্বতঃস্ফূর্ত।

আগে বলেছি, সামাজিক অস্তিত্বের অনুভব-মন্থিত স্বাতন্ত্র্য-অভিলাষী ব্যক্তি-সত্তার স্ববিরোধী মর্মান্দোলন ঘিরেই গড়ে ওঠে উপন্যাসের শিল্প-চরিত্র। আর "গোরা" রচনার কালে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবনা ভারতবর্ষের সদ্যোনির্মীয়মাণ উত্তাল ইতিহাস-প্রবাহের প্রতি নিবদ্ধ-চেতন হয়েছিল। অব্যবহিত অভিজ্ঞতা বিমর্দিত সেই জীবন-চিন্তনই উপন্যাসে 'মহাকাব্য'-রূপ ধরেছে।

এ-প্রসঙ্গে একটা সংশয় শুরুতেই কাটিয়ে নিতে হয়। "গোরা"কে বাংলা ভাষার প্রথম 'মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস' বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার একটা সীমা অবধি উপন্যাস মাত্রকেই বলতে চেয়েছেন[১৮] 'আধুনিক জীবনের মহাকাব্য'। এ-দুটি ভাবনায় পার্থক্য রয়েছে মাত্রাগত। প্রথমাবধি প্রকৃতি-পরবশ জীবমাত্রার বৃন্তে সমাজ-শক্তির স্বয়ম্পূর্ণ আদিম

১৭। দ্র. "গোরা" 'গ্রন্থ-পরিচয়'—র. র. ৪, পৃ. ৬৬৬

১৮। দ্র. Ralph Fox—"Novel and the people', P. 25

অভ্যুদয়জনিত মানবিক বিস্ময়ই মহাকাব্যের আকার-প্রকারে প্রতিফলিত। গ্রিক গরিমাবোধের সংরক্ষণে এথেন্সের কত অমেয় ব্যক্তিক সম্ভাবনা আপনার মধ্যে আপনি নির্জিত হয়েছিল "ইলিয়াড"-এ ; "রামায়ণ"-এ রামচন্দ্রের ঘরবাঁধা হল না কোনোদিন 'রঘুকুল'-এর সম্ভ্রম রক্ষার দায়ে। অপচয়িত ব্যক্তিত্বের সে দুর্মর আক্ষেপ মহাকাব্যোত্তর জীবনে ট্রাজেডির আর্তি ভরে অক্ষয় হয়ে আছে—"অ্যাগামেমনন" কিংবা "উত্তর রামচরিত"-এর মতো নাটকে।

উপন্যাসের মনঃপ্রেরণা আরো এক ধাপ পরবর্তী ; ব্যক্তিমানুষ যখন সমাজ-শক্তির একচ্ছত্রতার প্রতিস্পর্ধী হয়েছে—আর সমাজের প্রসার ছড়িয়ে পড়েছে বহিঃপরিবেশ হতে ব্যক্তিত্বের গভীর অবধি। 'আধুনিক' জীবন তাই স্ববিরোধে নিরন্তর দ্বন্দ্ব-জর্জর। কখনো তা রূপ ধরে একই মানুষের ভেতরকার ব্যষ্টি এবং সমষ্টি-চৈতন্যের অভিঘাতে—যেমন আছে "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল", কিংবা "চোখের বালি"তেও। কিন্তু এমনও যদি ঘটে, যেখানে সংঘাত ও জটিলতা মানুষের ভেতরকার দ্বৈতসত্তার সীমানা পেরিয়ে বৃহত্তর দেশ-কালের সংযোগে আরো ব্যাপক এবং বিসর্পিল হয়ে ওঠে, তখনই প্রত্যক্ষ সমাজ-প্রেক্ষিতে ব্যক্তিচরিত্রের দ্বান্দ্বিক বিকাশ কেবল বিস্তার ও বৈচিত্র্যে নয়, ঘন-গাঢ়তাবশেও এক নূতন মাত্রা আয়ত্ত করে, যাকে 'উদাত্ত' বলতে বাধা নেই ; মধুসূদন বলেছিলেন, 'Grand and Lofty'. বাংলা উপন্যাসের স্ববিরোধ-জর্জরিত 'আধুনিক' জীবন-সমস্যার গভীরে আদিম বিস্তার-বিস্ময়-বিস্ফারিত 'উদাত্ততা'র এই মাত্রা যোজনা করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ "গোরা"তে ; তাই নিয়ে তার 'মহাকাব্যধর্মিতা'। আর এই কারণেই "গোরা"র উপন্যাস-চরিত্রের মূল্য সন্ধানে দেশ-কাল-পরিপার্শ্বের সম্যক্ পরিচয়টি সংগ্রহ করে নিতেই হয় ; ইতিহাসের ঐ বিশেষিত প্রেক্ষিতেই তো উপন্যাস-জীবনের সকল ওঠা-পড়া এবং তার যা-কিছু আবর্তসঙ্কুলতাও।

অন্যপক্ষে, "গোরা"র রচনাকালের মতো তার গল্পকালও ঘটনা-ঘনঘটাচ্ছন্ন। বস্তুত, উপন্যাসের উপাখ্যান-অংশেই ঐতিহাসিক যোগাযোগের ভূরি পরিমাণ সংকেত রয়েছে। যদিও অনেক সময়েই হিসেবের জোড় মেলানো ভার হয়, যেমন মেলে নি, দেখেছি, "রাজর্ষি"তেও, স্বয়ং ত্রিপুর-পতির সোৎসাহ সহযোগিতা সত্ত্বেও। 'মিউটিনি'র সময়ে গোরার জন্ম ; —তার সূচনা ১৮৫৭-তে ; ঐ বছরকেই গোরার জন্মসাল ধরে নেয়া যায় যদি আপাতত, মূল গল্পের শুরু তাহলে তার অন্তত ২২-২৩ বছর পরে—অর্থাৎ ১৮৭৯-৮০ সালে। অমূল্যকে বিনয় বলেছিল, তার সকল পড়া শেষ হয়ে গেছে ; গোরারও তাই হবার কথা। আর এম্.এ. পাশ করতে ওরা দুজনে মোটামুটি বাইশ বছর বয়ঃসীমায় অন্তত পৌঁছে গিয়ে থাকলেও সময়টা ঐরকমই দাঁড়ায়। অন্যপক্ষে পরেশবাবুরা কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ব্রাহ্মই ছিলেন বলে মনে হয় ; বিনয় রবিবারে ব্রাহ্ম সভায় 'কেশববাবুর বক্তৃতা' শুনতে গিয়েছিল—পরেশবাবু-সুচরিতাদের সঙ্গে সেখানে তার দেখা হয়। তাছাড়া, বিতর্কের সময়ে হারাণবাবু বার বার প্রতিপক্ষের জন্য 'অনুতাপ ও ব্যাকুল প্রার্থনা'র প্রয়োজনীয়তার ওপরে জোর দেন—সে আদর্শ ছিল কেশব-প্রবর্তিত। অন্যপক্ষে পরেশবাবুর বৈঠকখানা-ঘরে বিনয় 'কেশববাবুর ফটোগ্রাফ'-এর সঙ্গে 'যিশুখ্রীষ্টের রঙিন ছবি'ও টাঙানো দেখেছিল। একি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৬৬) না 'নববিধান' সমাজ (ঘোষণা ১৮৮১)-এর কালের কথা! মনে হয়, এ কেশবানুগত্য হয়ত মাঝামাঝি সময়ের ;—১৮৮১-র পরে কেশবচন্দ্রের রামকৃষ্ণানুকূল্য-ও এমন স্তরে পৌঁছেছিল, যাতে ব্রাহ্ম-হিন্দুর ঝগড়ার বেলুন

কেশবানুরাগীদের পক্ষে অনেকটা চুপসে যেতে পারত ; হারাণবাবুর উত্তপ্ত ভূমিকাটি সে-পরিবেশে নিষ্প্রয়োজন—এমন কি অস্বাভাবিক হয়ে পড়তেও বাধা নেই। অথচ, উপন্যাসের গল্পকাল ১৮৮০-র খুব পেছনে টেনে নেবার অন্তরায় রয়েছে গোরার জন্মতারিখের মূলেই।

তার চেয়ে বড় সংশয়-সংকেতও রয়েছে উপন্যাস ঘটনার যোগাযোগে। (১) গোরা গ্রাম-ভ্রমণের সময়ে নীলকর-পীড়িত প্রজাদের দুর্গতি দেখেই প্রথমে বিচলিত হয়েছিল ; অথচ ১৮২৩ এবং '৩০-এর নীলচুক্তি বিষয়ক আইনের যে-সব ধারা প্রজাদের নির্মম উৎপীড়নের সমর্থক ছিল, শেষ পর্যন্ত ১৮৬৮-তে তা সবই রদ হয়ে যায়। যদিও ১৮৯২ সালে রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত হবার আগে অবধি অত্যাচার চলেছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু প্রবলতার হেরফেরও অল্পবিস্তর তাতে হয়ে থাকবার কথা। (২) সে যেমনই হোক, উপন্যাসের বিবরণই যদি এ-বিষয়ে মেনে নেওয়া যায়, তবু দেখি আনন্দময়ীকে বিনয় 'নূতন প্রকাশিত' বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শন" পড়ে শুনিয়েছিল। সে-সময়ে ১৮৭২ থেকে '৭৫-এর মধ্যে, ১৮৭৫-এর পরে বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন"-এর সম্পাদনার সঙ্গে আর কখনো প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন নি। ১৮৫৭-তে জন্মে থাকলে গোরার বয়স তখন ১৫ থেকে ১৮ বছর। ১৮ বছরের বেশ কিছু আগেই কি সে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জনের চূড়ান্ত ধাপ পেরিয়ে এসেছিল? (৩) এখানেও শেষ নয় ; ঔপন্যাসিক জানিয়েছিলেন "গোরা"র ঘটনাকালে 'দুই একজনমাত্র বাঙালি সিভিল সার্বিস-এ উত্তীর্ণ' হয়ে দেশে এসেছিলেন। ভারত তথা বাংলার প্রথম সিভিলসার্ভেন্ট রবীন্দ্রাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৬৪-তে দেশে ফিরেছিলেন। তাঁর পরবর্তী প্রধান সমকর্মাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারীলাল গুপ্ত ১৮৬৯-এ পরীক্ষা পাশ করে দেশে আসেন ১৮৭১-এ। এরপরেও যদি উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক সময়কে নামিয়ে আনা যায়, তবু গোরার বয়সের উচ্চতম সীমা হয় তখন ১৪ বছর। (৪) তার পরেও প্রবলতরভাবে উপন্যাসকাহিনীর সংগতি আহত হয় বিনয়-ললিতার পরিণয়ের ঝড়ো ঘটনাবর্তে। ব্রাহ্ম-সংস্কার অনুযায়ী বিবাহ অনুষ্ঠানের পথে বিনয়ের মনের নানা অন্তরায় নির্দেশ করতে লেখক বলেছিলেন, "কিছুকাল হইল সিভিল বিবাহ আইন পাশ হইয়া গেছে। সে-সময়ে গোরা ও বিনয় কাগজে ঐ আইনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আলোচনা করিয়াছে।" আর ইতিহাসের সূত্রে জানি,[১৯] মুখ্যত কেশবচন্দ্রের চেষ্টাতেই 'সিভিল ম্যারেজ আইন' প্রচলিত হয়েছিল ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৫৭-তে জন্মে থাকলেও গোরার তখন ১৫ বছরের বয়ঃসীমাও পেরোবার কথা নয়।

ইতিহাসের হিসেবছুট এই ঘটনাবর্তের টানা-পড়েনে উপন্যাসের গল্পকাল যেখানে পৌঁছাতে চায়, উদ্দাম আবর্ত সঙ্কুল এই বিপুল জীবনকথা শেষপর্যন্ত তাতে নিতান্ত বালখিল্যলীলায় পর্যবসিত হতেই পারত। অবিরল বহমান জীবন-প্রচ্ছদে ত্বরিত-সচল চরিত্রাবলির আনাগোনা এবং আচরণের মৌলিক অসংগতি গোটা উপন্যাসকে অবিশ্বাস্য করে তোলাই বরং ছিল সম্ভব। অথচ তারপরেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস'রূপে আজও সে সর্বস্বীকৃত। এই আপাতবিরোধের গ্রন্থি মোচন করতে আবারো মনে হয়—উপন্যাস নিশ্চয়ই বাস্তবতাজীবী শিল্প, তাহলেও বস্তুনির্ভর তথ্য-পঞ্জীর পরিণাম ফল

১৯। দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার—"বাংলাদেশের ইতিহাস" (তৃতীয় খণ্ড) পৃ. ১৭৭

নয়। বরং, বিশেষিত এক তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে শিল্পীর মনোভাবনা যে বিচিত্র সংবেদী প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে, তারই অব্যবহিত ফসল। আর এই কারণেই "গোরা"র উপন্যাস-গুণের সন্ধানে সমকালীন শিল্পি-মনোলোকে অনুপ্রবেশ অনিবার্য হয়। বস্তুত রবীন্দ্র-মনের অব্যবহিত জীবন-সম্পৃক্ততার আলোড়নে "গোরা" রচনার অনুকূল অবচেতন প্রস্তুতি ভেতরে-ভেতরে তৈরি হয়েই চলেছিল হয়ত দীর্ঘদিন ধরে।

প্রথমেই আসতে হয় "গোরা"র রচনাসময়ের অসাধারণ ঐতিহাসিক পটভূমিটির সন্ধানে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯০৭ খ্রিস্ট-সালে "গোরা"র রচনারম্ভ, আর তার সমাপ্তি ১৯০৯ সালে। বাংলাদেশের মাটিতে অভ্যুদিত স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) উচ্ছ্বসিত স্রোতোধারা সারা ভারতের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের চড়ায় ঠেকে তখন আবর্তসঙ্কুল হয়ে পড়েছে। দূর হতে উৎসুক চোখে সেই আর্ত পরিণামের প্রতি তাকিয়ে দেখছিলেন জীবন-প্রিয় কবি। সুরাট কংগ্রেসের দক্ষযজ্ঞ ১৯০৭-এর ডিসেম্বরের ঘটনা। কিন্তু ঐ বছরেরই শুরুতে, "গোরা"র রচনা আরম্ভ হবারও আগে, কলকাতা-কংগ্রেসোত্তর ঝটিকার আভাস ঘন হয়েছিল।[২০] অনেক ভরসাভরে কবি ১৯০৫-এ বাংলার আন্দোলনে পুরোবর্তী ভূমিকা নিয়েছিলেন ; কিন্তু বিফল বুঝে কর্মের ক্ষেত্র হতে ফিরে আসেন তিন মাসের মধ্যেই।[২১] তবু মনের সকল আগ্রহ ছিল ঐ কর্মক্ষেত্রের অভিমুখেই। ঐতিহাসিক বলেছেন,[২২] ১৯০৫-এর সূচনাকালে স্বদেশী আন্দোলন ছিল হিন্দু মুসলমানের সামবায়িক আয়াসে ঘেরা ; কিন্তু বছর না গড়াতেই বিভেদ অনিবার্য হল ; ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে "ঢাকা শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে 'মুসলীম লীগ' প্রতিষ্ঠিত" হয়। এ-সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তির চতুরতার অনুযোগ যতই করা হোক, দুর্বলতার মূল নিহিত ছিল আমাদের জাগরণশীল স্বদেশী ভাবনার গভীরেই। রবীন্দ্রনাথ সেই সংকট-কালেই বলেছিলেন,[২৩] "মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না।" সেই ছিদ্রটি আসলে উনিশ শতকের প্রথমাবধি বাঙালির 'নবজাগরণ' এবং তদুত্তর কালের ক্রমবিকাশমান জাতীয়তাবাদের মূলে হিন্দু-সম্প্রদায়চেতনার আধিপত্য। সেদিন বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ-এর নামান্তর। এমন কি দেবেন্দ্রনাথ-পৃষ্ঠপোষিত 'জাতীয় মেলা'র ঐতিহাসিক আবেদনও 'হিন্দুমেলা' নামের অন্তরালে সীমিত হয়ে পড়েছিল। কিংবা 'বন্দেমাতরম্'-এর মতো অমর সংগীতেরও উদ্ভব তো হিন্দু দেব-ভাবনার মূল হতেই। ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিনেও ভোর বেলা শহর কলকাতার 'শত শত নরনারী' কালীঘাট মন্দিরে সমবেত হয়েছিলেন প্রার্থনা নিবেদন করতে।[২৪] রামেন্দ্রসুন্দরের অবিস্মরণীয় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' কিংবা 'অরন্ধন ব্রত'র পরিকল্পনাও হিন্দু আচার-আচরণকে আশ্রয় করেই। অতবড় জাতীয়

২০। দ্র. তদেব—পৃ. ৯৬-১০৫

২১। দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-"রবীন্দ্রজীবনী"-২ (১৩৬৮), পৃ. ১৪৬

২২। দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৭১

২৩। 'ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' : 'পরিশিষ্ট'—"সমূহ", রর ১০, পৃ. ৬২৭

২৪। দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৩

জাগরণযজ্ঞে অহিন্দুর প্রবেশ পথ সংকীর্ণ হয়েই ছিল ; কেবল 'রাখীবন্ধন'-এর অপরূপ প্রেরণাভরে রবীন্দ্রনাথই সেদিন নাখোদা মসজিদ অবধি ভ্রাতৃত্বের আন্তরিক বাঁধনটিকে টেনে নিয়েছিলেন।[২৫] তাহলেও বিভেদের দূরত্ব সেদিন সীমাতিক্রমী হয়েছিলই।

দেশজোড়া উত্তাল অভ্যুদয়-প্রয়াসের সেই পাণ্ডুর অবসান-সম্ভাবনা কবিমন-কে আমূল আলোড়িত করে চলেছিল অনবরত ; আর রবীন্দ্রনাথের সৃজনী চেতনায় "গোরা"র জন্ম সেই আন্তরিক আন্দোলনের উৎসভূমিতে। পশ্চাৎপটে ভিড় করেছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পুঞ্জিত স্মৃতি-সম্ভার, উপন্যাসের প্রচ্ছদ আসলে শিল্পীর মনোভব সেই স্মৃতিনির্যাস দিয়ে গড়া—ইতিহাসের মূল ঘটনাপ্রবাহে নয়। কবি সেদিন নিশ্চিত বুঝেছিলেন,—ভারতের জীবন-জাগরণের পক্ষে ধর্ম-সম্প্রদায়গত গণ্ডিবদ্ধতা কেবল নিরর্থক নয়—আত্মনাশী মহামিথ্যা। সেই দৃঢ় প্রত্যয়বশেই আদ্যন্ত উপন্যাসের 'জীবন-দর্শন' সঞ্জীবিত। সেই প্রত্যয়ের মূর্তি গড়তেই ঔপন্যাসিক আপন জীবনের অতীতলোকে পশ্চাদপসরণ করেছেন—হিন্দু জাতীয়তাবাদের উগ্রতা যেখান থেকে প্রখর হতে শুরু করেছে।

১৮৮৪-তে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি কর্তৃক আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন, এবং দীর্ঘকাল তিনি সে-পদে বৃত ছিলেন। ঐ বছরের আরম্ভেই কেশবচন্দ্র তিরোহিত হন ; ঐ বছরেই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের পুনরভ্যুদয়বাহী "প্রচার" এবং "নবজীবন" পত্রিকা-দুটির উদ্ভব ঘটে। নব্যহিন্দুত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠার গোঁড়ামি-ছাওয়া অন্ধ প্রয়াস এবং প্রতিমুখী প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু-ব্রাহ্মের বিরোধবিতণ্ডা সেদিন মাত্রাতিক্রমী হয়ে উঠেছিল ; আদি ব্রহ্মসমাজের উদ্যমী তরুণ সম্পাদকও সেই ঝড়ের হাওয়ায় প্রবল দোল দিয়ে ফিরেছিলেন। 'হিন্দু'-কে একটি 'নেশন' রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেখার আগ্রহ সেদিন ছিল ঐকান্তিক। ভারতবর্ষীয়তাকে হিন্দুত্বের অনুপাতে সমীকৃত করে নেবার প্রবণতা রবীন্দ্রনাথেরও এক সময়ে ছিল, এমন কি ১৯০৪ সালে লেখা বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধেও তাঁর উচ্চারণ অকুণ্ঠ।[২৬] আসলে আদি ব্রাহ্মসমাজের ঘোষিত আদর্শ অনুসারে রবীন্দ্রনাথও সেদিন ছিলেন মনে-প্রাণে সংস্কার-ব্রতী হিন্দু। অন্যপক্ষে নব্যহিন্দুরা অনেকেই ছিলেন সংস্কারান্ধ। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের উদার সহজ মানবিকতাবোধ জাতীয়তার সীমায় হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-নির্বিশেষে সকলকেই অনায়াস সামঞ্জস্যে আহ্বান করে নিয়েছিল ; অথচ গোঁড়া হিন্দু সংস্কার ছিল সর্ব-পরিচ্ছিন্ন আত্মখণ্ডিত। আচার-আচরণের নবজাগ্রত অন্ধতার সঙ্গে গুরুবাদের প্রতি মত্ত আগ্রহ, মন্ত্রতন্ত্র সন্ন্যাসী-যোগীর প্রতি বিচারহীন আত্মসমর্পণের ঘটনাবলিও ছিল সাধারণ প্রবণতা।[২৭]

এই প্রেক্ষাপটে "গোরা"র গল্পের প্রতি লক্ষ করলে বোঝা যাবে, গোরা নিজে এই জাতীয়তাবাদেরই প্রবক্তা। 'স্বদেশী সমাজ'-এর হিন্দু-জাতীয়তাবুদ্ধির আদর্শের সঙ্গে

২৫। দ্র. অবনীন্দ্রনাথ ও রানী চন্দ—"ঘরোয়া", পৃ. ২৫-২৬

২৬। "হিন্দু ধর্ম কি আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিনই, এই আমাদের দেবতার বিহারস্থল, প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্যার আশ্রম, পিতৃ পিতামহদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে পারিবে না? 'স্বদেশী সমাজ', "আত্মশক্তি" র. র., ৩, পৃ. ৫৩৮। "হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহার একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, হইবে হিন্দু।" তদেব, পৃ. ৫৫০

২৭। দ্র. প্রভাত মুখোপাধ্যায়—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড (১৩৭৭)-পৃ. ২১০-২১১

রক্ষণশীল নব্য হিন্দু সমাজের আচার-আচরণগত গোঁড়ামির সংযোগ-সংঘাতে গড়া হয়েছে তার ব্যক্তিত্ব। গোরার ভারত-চেতনার গভীরে প্রবল জোর ছিল। কেউ বলেছেন, ব্রহ্মবান্ধবের দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের রবীন্দ্র-ভাবিত স্বাক্ষর-চিহ্নিত তার চরিত্র ; কেউ ভেবেছেন নিবেদিতার কথা। সে যেমনই হোক, সে-চরিত্রে কোথাও সংকোচ-সংকীর্ণতা বা দ্বিধার লেশমাত্র খুঁজে পাবার উপায় নেই। এই প্রসঙ্গেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক তার্কিক-সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথের অক্লান্ত দৃপ্ত মূর্তিটি মনে পড়াও কিছু অসম্ভব নয়। তাছাড়া আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তায় অবিচল, আত্মসমর্থনে বজ্রকঠিন, যুক্তিতর্কে ক্ষুরধার ঝটিকাগতি গোরার পেছনে বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের ভাব-সুরভিও সক্রিয় ছিল কী?[২৮] গোরার কণ্ঠে বিশেষ করে ভারতবর্ষের সকল কিছুকে নির্বিচারে গ্রহণ করে তবেই তার বিচার বিবেচনা করবার অধিকার আসতে পারে—এই আবেগদৃপ্ত ঘোষণাটির জোর অবিস্মরণীয়।

কিন্তু ১৯০৪ থেকে ১৯০৭ রবীন্দ্র-অভিজ্ঞতার ইতিহাসে অনেক দূর পথ—'স্বদেশী সমাজ'-এর দূরদৃষ্টি-তীক্ষ্ণ ভাবাদর্শের জগৎ পেরিয়ে 'বঙ্গভঙ্গ', 'স্বদেশী', 'বয়কট' হতে একেবারে নরম-গরমপন্থীর আত্মনাশী রাজনৈতিক সংঘাত ! ততদিনে রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদায়বদ্ধ ধর্মের জগৎ হতেও মনে প্রাণে ছুটি নিয়েছেন ; যদিও তখনো ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের ভূমিকায় ছিল তাঁরই নাম। তবু আদি, নববিধান, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলহ-কোলাহল ছাপিয়ে মুক্তধর্ম তথা ঐকান্তিক মানব-চেতনার সন্নিহিত হয়ে পড়েছে কবি-মন। সেখানে পরেশবাবু আর আনন্দময়ী আত্মার সগোত্র, অন্যপক্ষে কৃষ্ণদয়াল-হরিমোহিনী কিংবা পানুবাবু-বরদাসুন্দরীতে চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য অল্পই। আর সমাজ-বিচ্যুত পরেশবাবুর অন্তর্ব্যথিত অপার মহিমা সম্প্রদায়-ধর্ম থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের 'মনের মাধুরী' মিশিয়ে গড়া ভাবতেও বাধা নেই।

আসলে ঐটেই "গোরা"র রবীন্দ্র-মনোভব গল্পকাল ; আপন শৈশবস্মৃতির ক্ষীণ সূত্রে ১৮৮৪ ও তদুত্তর ব্রাহ্ম-হিন্দু তথা ব্রাহ্ম-ব্রাহ্ম সংঘাতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পসরা ঘেঁটে গড়া হয়েছে উপন্যাসের বৃহদায়তন প্রচ্ছদপট। হিসেব করলে দেখব, গোরার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বয়সে মাত্র চার বছরের ছোট। নিজের সংস্কার, স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা মিশিয়ে জীবন-ইতিহাসের কাঠামোটি আপন হাতে গড়েছেন দ্বিধাহীন স্বতঃস্ফূর্তিতে—গোরার তর্ক-সিদ্ধান্ত-আচরণের মতোই "গোরা"র স্রষ্টার লেখনীও সমপরিমাণে দুর্নিবার—অমোঘ।

২৮। মনে রাখতে হয়, ১৯০২ খ্রিস্ট-সালে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান ; ১৯০৮ সালে "প্রবাসী"তে "গোরা"র প্রকাশ চলা কালেও 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে (ভাদ্র, ১৩১৫) প্রসঙ্গত ভারতীয় যুবজাগরণের ইতিহাসে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধায় বিবেকানন্দের ভূমিকা স্বীকার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ; বিবেকানন্দ সম্পর্কে এই সশ্রদ্ধ মূল্যচেতনা রবীন্দ্র-ভাবনায় বিচলিত হয়নি।

একটা কথা এখানে ভেবে দেখবার মতো। গোরা চরিত্রের উদ্ভাবনে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বয়ং রবীন্দ্র-চরিত্রের অব্যবহিত প্রভাবের প্রসঙ্গ নানা স্তরে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু সৃজনীকল্পনার উৎস হিসেবে বাস্তব ঘটনা ও চরিত্রের হুবহু প্রতিফলনের ধারণা নিছক যান্ত্রিক এবং নিরর্থক। নানা অভিজ্ঞতা ও অনুভবের যোগ-বিয়োগের সঞ্চয়ে ক্রম-উন্মোচিত ভাব-কল্পনা চরিত্রের বিমূর্তরূপ ধারণ করতে পারে কেবল শিল্পীর 'আপন মনের মাধুরী' মন্থনে। জীবন-অন্বেষু শিল্প-পাঠককে কেবল বস্তু-সমুখ সেই নির্যাসটুকুর রহস্যই খুঁজে দেখতে হয়। তার বেশি এগোলে সৌন্দর্যের অনির্বচনীয় সংবেদন তথ্যস্তূপের পাথর চাপা হয়ে মরে।

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন[২৯], "তথ্য, যাহাকে ইংরেজিতে ফ্যাক্ট কহে, সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি ও কল্পনা বলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।"—এ অনুভব বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্র" বিশ্লেষণ প্রকরণের প্রসঙ্গে। "গোরা"তে কবি সমকালীন ইতিহাসের ঘটনা-পরম্পরাগত কাঠামোটি বিদীর্ণ করে তার ভেতর হতে যুগ-'সত্য'—'স্পিরিট অব্ দ্য এ এজ' বলি যাকে, তার পূর্বাপর-সম্পূর্ণ চরিত্রটির রূপরেখা গড়তে চেয়েছেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনে কেশবচন্দ্রের সর্বাত্মক আত্মসমর্পণের কাল (১৮৬১) হতে রবীন্দ্রনাথের নিজের আদি ব্রহ্মসমাজের সম্পাদকতার সময় (১৮৮৪-১৯১২) অবধি ছড়ানো ঘটনা-বাহিত শিল্পীর জীবনানুভব নতুন উত্তাপ আহরণ করেছিল বঙ্গভঙ্গ-কালীন তাঁর ব্যক্তিগত মর্মমন্থনের সংস্পর্শে। "গোরা"র শিল্প-রূপ সেই অনুভবের নির্যাস সঞ্জীবিত; গোরার জীবনে তার অভিব্যক্তি অভিনব ভারত-ভাবনা রূপে, রবীন্দ্র-চেতনায় তার অন্তিম পরিণাম সর্বমানবিকতা-বোধে।

সুচরিতাকে গোরা বলেছিল, "হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়া লোকেরা, বিশেষত যারা হঠাৎ নতুন গোঁড়া হয়ে উঠেছে, তারা যেভাবে কথা কয় আমার কথা সেভাবে গ্রহণ করবেন না। ভারতবর্ষের নানাপ্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। সেই ঐক্যের আনন্দেই, ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম তাদের সঙ্গে এক দলে মিশে ধুলোয় গিয়ে বসতে আমার মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না। ভারতবর্ষের এই বাণী কেউ বা বোঝে কেউ বা বোঝে না—তা নাই হল—আমি আমার ভারতবর্ষের সকলের সঙ্গে এক—তারা আমার সকলেই আপন—তাদের সকলের মধ্যেই চিরন্তন ভারতবর্ষের নিগূঢ় আবির্ভাব নিয়ত কাজ করছে, সে সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ মাত্র নেই।"

'হঠাৎ নতুন গোঁড়া' বলতে নব্য হিন্দুত্বের সংস্কার যদি মনে ধরাও থাকে, তবু ভারতভাবনার এই চরিত্রটি কিন্তু "গোরা"র স্রষ্টার আন্তরিক বিশ্বাস সঞ্জাত। জীবনের প্রায় উপান্ত-বেলাতেও স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন,[৩০] "দেশ মানুষের সৃষ্টি...মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত।" ঝঞ্ঝাতাড়িত সতেজ চারা গাছটির মতো এ-অনুভব কবি-মনে আমূল আলোড়িত হয়ে চলেছিল "গোরা" রচনার পূর্বাপর সময়ে। "আত্মশক্তি"র রচনাবলির কাল হতে, কিংবা তারও পূর্বাবধি, কবির অনন্য আগ্রহ ছিল দেশীয় মানুষের সার্বিক জাগরণের মাধ্যমে দেশের মুক্তিসাধনের। 'স্বদেশী সমাজ'-এ সে-পরিকল্পনা প্রথম সুঠাম অবয়ব পেল। "গোরা"-সমকালীন ভাবনার জীবন্ত ছকটি রয়েছে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর 'সভাপতির অভিভাষণ'-এ।[৩১] আর দেশের মানুষ বলতে রবীন্দ্রনাথ পল্লীজীবী

২৯। 'কৃষ্ণচরিত্র', "আধুনিক সাহিত্য" র. র. ৯ পৃ. ৪৫৪

৩০। র. র. ১. 'অবতরণিকা'—পৃ. ১৷৷০

৩১। দ্র. 'সভাপতির অভিভাষণ,' "সমূহ", র. র. ১০, পৃ. ৪৯৬-৫২২। ড. সুকুমার সেন আগেই জানিয়ে রেখেছেন, "গোরা"র ঘোষপুর-পরিক্রমণ কাহিনীর মূলে ঐ অভিভাষণে কথিত রবীন্দ্র-অভিজ্ঞতার শ্রুতিচ্ছায়া রয়েছে।—দ্র. "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", ৩য় খণ্ড ("রবীন্দ্রনাথ") (১৩৬৮) পৃ. ৩৬৯ পা. টী.

নিরক্ষর সরল গ্রামবাসীদের কথাই ভেবেছিলেন প্রধানত। বাংলাদেশের নবজাগরণ-পুষ্ট শহুরে বুদ্ধিজীবী মানসিকতায় রবীন্দ্রনাথের দেশ-দেখা চোখের এ আবিষ্কার অনন্য।

একেবারে "করুণা"র প্রসঙ্গেই দেখেছি, বাঙালি জীবনের খাত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল শহর-গ্রামের দুই খণ্ডে ; দুটি সমান্তরাল ধারার বিচ্ছেদ-ভাবনা তখন হতেই রবীন্দ্র-অবচেতনায় নিহিত ছিল। "চোখের বালি"-"নৌকাডুবি" যে শহুরে বুদ্ধিজীবী সমাজ-বিচ্ছিন্ন নিষ্কর্মা জীবনেরই ফসল, সেকথা আগে লক্ষ করে এসেছি। "গোরা"তে রবীন্দ্রনাথের প্রাণমনের সাধনা ছিল সেই বিভক্ত জীবনস্রোতকে একত্র মিলিয়ে দেখার। শহর-গ্রামের সেতুবন্ধনের ঐতিহাসিক উদ্যম উৎসারিত হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের কালে ; শহরের তরুণেরা 'স্বদেশী' ফিরি করতে যেত গ্রামে—কত 'বাবু' তাঁত বুনতে বসেছেন, কত নেমেছেন চাষের মাঠে! তার উচ্চারণ আছে পাবনার 'অভিভাষণ'-এও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ আরো প্রাচীন—তাঁর আকাঙ্ক্ষা আরো মৌলিক।

বাংলা, তথা ভারতবর্ষও আসলে 'গ্রামে গাঁথা' দেশ ; গ্রামেই জাতির প্রাণের প্রতিষ্ঠাভূমি। শহুরে বুদ্ধিজীবীরা যদি জাতির মস্তিষ্কই হন, প্রাণের প্রবাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার সামর্থ্য বিশুষ্ক হয়ে যাবারই কথা। এই স্পষ্ট অনুভব রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছিলেন ১৮৯১ সালে জমিদারির ব্যবস্থাপনা-সূত্রে পদ্মা-বিধৌত গ্রাম-বাংলার সংস্পর্শে পৌঁছে অবধি। একদিকে বিদেশী শাসকের দেশজোড়া অত্যাচার ও অবমাননার ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা, আরেক দিকে গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনে সহজ-মানুষ্যত্বের বিস্ময়কর অভিব্যক্তির আবিষ্কার—দুয়ে মিলে দেশীয় জীবন গড়ার সঠিক নিশানাটি কবির চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। কিন্তু কয়েক শতাব্দী ব্যাপী পুঞ্জীভূত জড়তা, অবসাদ, আর অবক্ষয়ের টানে সে-পথে এগোবার অবকাশ কত যে দুস্তর হয়ে পড়েছিল, সে অনুভবও তাঁর বস্তুঘনিষ্ঠ দৃষ্টির কাছে গোপন থাকে নি। 'ব্রাহ্মণ'-এর মতো প্রবন্ধ,[৩২] কিংবা 'মেঘ ও রৌদ্র'র মতো গল্পে[৩৩] তার দ্বিধাহীন প্রকাশ। দেশের নাড়ির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তবেই স্বদেশ-হিতের সাধন, এই দ্বিধাহীন আদর্শে সর্বদা অবিচল ছিল রবীন্দ্রনাথের চেতনা এবং সাধনা। বিশেষ দেশকালোচিত ঘটনা-বিক্ষেপে উদ্বোধিত সেই ভাবাদর্শেই উজ্জীবিত গোরার ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু উপন্যাসের চরিত্র আদর্শের ফানুস নয় কখনোই ; গোরার ব্যক্তিত্বে আধুনিক মানুষের সহজাত অন্তর্বিরোধের তীব্রতম উদ্বেজনা তাকে সজীব—অবিরল গতিময় করেছে। ভারতবর্ষের যে মানুষদলের সঙ্গে গোরা ধুলায় বসতেও উৎসুক—তাদের মধ্যে কোনো জাতিভেদ নেই, শ্রেণিভেদও না ; তারা হিন্দু নয়, মুসলমানও নয় ; কিংবা তারা সাক্ষর না নিরক্ষর, শহুরে না গেঁয়ো, মধ্যবিত্ত অথবা নির্বিত্ত—এ-সব প্রশ্ন অবান্তর! নিরীহ মুসলমান বৃদ্ধটিকে ছড়ির আঘাত করে, তার সকল পসরা ধুলায় লুটিয়ে যে-বাবুটি জুড়িগাড়ি চালিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, খুঁজলে হয়ত দেখা যেত তিনি হিন্দু-ই। কিন্তু গোরা যে প্রতিবিধান করতে প্ররোচিত হয়েছিল সেদিন, সে কেবল এক ভদ্রলোকের অপরাধের প্রতিবাদে আরেক ভদ্রলোকের প্রায়শ্চিত্ত নয় ; নিরপরাধ নির্জিত মানুষের প্রতি অমানুষিকতার প্রতিবাদ। স্বদেশি-বিদেশীরও কোনো ভেদ-ভাবনা নেই এ-সব ক্ষেত্রে। চরঘোষপুরে যেমন দেখি,

৩২। দ্র. 'ব্রাহ্মণ', "ভারতবর্ষ" র. র. ৪, পৃ. ৩৮৭-৪০২

৩৩। দ্র. 'মেঘ ও রৌদ্র', "গল্পগুচ্ছ" র. র. ১৯, পৃ. ২১০-২৩৫

বিদেশী অমানুষিকতার প্রতিবাদে প্রখর হয়েছিল সে, অনিবার্য কারাবরণের দুঃসম্ভাবনাকেও উপেক্ষা করে।

অথচ, আচার-আচরণে এই গোরার মনই কত অন্ধ সংস্কারের নিগড়ে বাঁধা! নিগৃহীত যে-মুসলমান বৃদ্ধটিকে সে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে, তার হাতের জলস্পর্শ করবার উপায় নেই গোরার। কিংবা আবাল্য ধাত্রী খ্রিস্টান পরিচারিকাটি রয়েছে বলে মায়ের মহলেও তার জলগ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অন্যপক্ষে চরঘোষপুরে গিয়ে ঐ নীতিটিও টালমাটাল হয়ে পড়ে অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত অভিঘাতে। 'দুর্বৃত্ত অন্যায়কারী মাধব চাটুজ্জে'র ভাত খেয়ে জাত বাঁচাবার কথা সে ভাবতে পারে নি—তার চেয়ে সেই বুড়ো নাপিতের ঘরেই ফিরে গিয়েছিল, মুসলমানের অনাথ নিরন্ন শিশুকে যে-দম্পতি সন্তানের মতো বুকে করে পালন করেছিল। গোরা সেদিন ভেবেছিল, 'পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ-কি অধর্ম করিয়া তুলিতেছি!'

তবু সত্যকে জানা এবং মানতে পারার সামর্থ্যে তফাত অনেক ; গোরার মতো প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের পক্ষেও তাই! শেষ পর্যন্ত ঐ নাপিতের ছোঁয়া জলও সে খেতে পারে না ; নিজ হাতে ঘটি মেজে জল তুলে তৃষ্ণা নিবারণ করে। গোরার চারপাশে ভারতবর্ষের জীবনের টানে হিন্দু জাতীয়তাবোধের নির্মোক এমনি ভাবে বিবর্ণ হতে হতে খসে পড়ছিল। কিন্তু সে-তো নিছক সাপের খোলস ছাড়া নয়! প্রতিপদে তার অঙ্গচ্ছেদের মর্মান্তিক যন্ত্রণা—আমূল আত্মমন্থন! "গোরা" উপন্যাসের বহির্ঘটনা-পুঞ্জিত জীবন-প্রবাহে ব্যক্তি-চিত্তের এই অগ্নিদাহী বিস্ফোরণ তার 'আধুনিক মহাকাব্য'-চরিত্রকে অবারিত করেছে ; সচেতন-স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের আত্ম-উন্মোচন যেখানে বহিঃপ্রেক্ষিতের সংঘর্ষে উত্তাল কুটিল হয়েছে। এ যন্ত্রণা এবং উন্মোচন কেবল গোরার একার নয়। গোরা-সুচরিতা, বিনয়-ললিতা নিরন্তর আত্ম-সংঘাতের এই অন্তবিহীন পথ পেরিয়েই উত্তীর্ণ হয়েছে শেষ পর্যন্ত জীবনের নির্দিষ্ট পরিণতিতে। গোরার চেতনায় সে-উত্তরণ 'চিরন্তন ভারতবর্ষ'র অনুসন্ধানে ; সুচরিতা সেই যাত্রাপথে তার সহচারিণী ; যে-ভারতবর্ষের কথা সাগ্রহে বলেছিল সুচরিতাকে একদিন গোরা—যে 'ভারতবর্ষ' সমুখ ইতিহাস-চেতনায় সমৃদ্ধ কবিমনের নিরন্তর স্বপ্নের ধন! উত্তরণের এই অবিরাম দুরন্ত আয়াস—আর তার স্তব্ধতাকর, অথচ অমেয় প্রতিশ্রুতিপূর্ণ পরিণাম, গোরার জীবন-কথাকে সেই বৃহত্তর ভারত-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে—নবযুগের নতুন মহাভারত-এর স্বপ্ন তার মজ্জায় মজ্জায় ওতঃপ্রোত অনুস্যূত।

ঐখানে গোরার আরো এক মাত্রা—সঠিক আধুনিক ভারতীয়ের মাত্রা। সে কেবল হিন্দু-জাতীয়তাবাদের দুর্নিবার প্রবক্তা নয়, কেবল নয় চিরন্তন ভারত-ধর্মের প্রাণপ্রদীপ্ত অবধারক। আসলে মধ্যবিত্ত শহুরে বাবু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও সে, সমকালীন ঔপনিবেশিক জীবনব্যবস্থায় দেশজোড়া বৃহত্তর জীবনস্রোত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা যাদের! মধ্যবিত্ত জীবনের বিচ্ছিন্নতার বিড়ম্বনা, এবং ভারতবর্ষের সংহত জীবন-সাধনার পক্ষে তার বিভেদমূলক ভয়াবহ পরিণাম, রবীন্দ্রনাথের মতো কোনোদিন অনুভব করেন নি কেউ। গ্রাম্য 'ছোটলোক'দের সম্পর্কে শহুরে ভদ্রলোকের উপেক্ষা, অজ্ঞতা ও বিমুখতার কুৎসিত কিন্তু সঠিক ছবিটি এঁকেছেন গোরার ভ্রমণ-কাহিনীর উপলক্ষে। ঐটুকুই একমাত্র নয়, গ্রাম-শহরের ঐ বিভেদ-বিচ্ছিন্ন জীবনের পরস্পর সমান্তরাল দুটি ধারাকে আবার এক সূত্রে মিলিয়ে দিতে পারাতেই যে 'চিরন্তন ভারতবর্ষ'র উজ্জীবনপন্থা, সে দিশেটিও ধরা আছে ঐ "গোরা"

উপন্যাসেই ; এবং ঐ একবারের জন্যেই। তার পরের উপন্যাস "চতুরঙ্গ"তেই শহুরে মধ্যবিত্তের স্বতোবিচ্ছিন্নতার প্রথম চূড়ান্ত সমুদ্ভাস। রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টিকে নানা দিক হতেই গ্রহণ করেনি আধুনিক ভারতের ইতিহাস!

সে যেমনই হোক, এইখানে 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের শশিভূষণের সঙ্গে গোরার পার্থক্য মৌলিক। শশী শহর হতে গ্রামে এসে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিল না পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে। অন্যপক্ষে শহরবাসী হয়েও গোরা প্রতিদিন গ্রাম-পরিক্রমার—গ্রামজীবনে সাধারণ মানুষের সঙ্গী হবার ব্রত গ্রহণ করেছিল কারাগার থেকে ফিরে আসার পর হতে। ঐখানে তার সাধনার ভারতবর্ষ—সন্তানের সমর্থ সেবালাভের আকাঙ্ক্ষায় জননী যেখানে উন্মুখ! ঐ পরিক্রমা-সূত্রেই সে আবিষ্কার করেছিল, "এই সকল পল্লীতে সমাজের বন্ধন শিক্ষিত ভদ্র সমাজের চেয়ে অনেক বেশি।" অথচ "এই সমাজ মানুষকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করে না, বিপদের সময় ভরসা দেয় না, কেবল শাসনের দ্বারা নতি স্বীকার করাইয়া বিপন্ন করে।" দুর্দশার এই সার্বিক অমোঘ রূপটির প্রতি তাকিয়ে গোরার বিতর্ক-প্রবৃত্তি শিথিল-শিহরিত হয়ে আসে—"...সেখানে সত্যকে সে কোনো প্রকার আবরণের ভিতর দিয়া দেখে না। দেশের প্রতি তাহার অনুরাগের প্রবলতাই তাহার সত্যদৃষ্টিকে অসামান্য তীক্ষ্ণ করিয়া দেয়।" গোরার তীক্ষ্ণ অনাবিল সত্য দৃষ্টির বশেই "গোরা" উপন্যাস সর্বভারতীয় জীবনধর্মের অবিস্মরণীয় 'মহাকাব্য' হয়ে উঠতে পেরেছে।

গোরার মধ্যে স্ববিরোধের যে আলোড়ন তর্কের ফেনপুঞ্জে উত্তাল, তারই প্রশান্ত নিভৃত, কিন্তু নিশ্চিত, স্বাক্ষর পরেশবাবুর চরিত্রের উন্মোচনেও। পরেশবাবুর প্রশান্তিকে নিষ্প্রাণতা বলে ভুল করবার উপায় নেই। ললিতাকে বিনয় বিয়ে করতে চায়, কিন্তু বিনয়-ললিতা কেউই সে-বিবাহে ব্রাহ্ম আচার-অনুষ্ঠানের অনিবার্যতা স্বীকার করে না। এই ঘটনাকে ঘিরে পরেশবাবুর আযৌবন বিশ্বাস কী আমূল অভিঘাতে মথিত হয়েছিল ; নিজের ভেতরকার সংস্কারের কত দুস্তর বাধা চেতনার তল অবধি ঠেলে ঠেলে তবেই সত্যকে যথাযথরূপে গ্রহণের সামর্থ্য হয়েছিল তাঁর। আবার কী দুঃসহ আঘাতে আত্মস্থ হতে হয়েছিল তাঁকে, যখন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন—কেবল ধর্ম-সংস্কারের বাঁধন কাটানো সম্ভব হল না বলেই গোরাও মুখের ওপরে জানিয়ে দিতে পারে—বিনয়ের বিয়েতে যোগ সে দেবেই না। শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্যে পায়ের তলার মাটিটুকুও রইল না তাঁর ঘরে-পরে কোথাও। নির্বাক সংযমের মর্মলীন কী অপরিমেয় প্রচ্ছন্ন দাহ! সেই শেষ দৃশ্যটি অন্তর দিয়ে প্রত্যক্ষ করবার মতো—নিঃসঙ্গ পরিবার হতে বেরিয়ে পড়বার তাগিদে পরেশবাবু অনভ্যস্ত হাতে বাক্স গোছাতে বসেছিলেন যেখানে।

আনন্দময়ী-তে সে পরিণতি নেই ; কিন্তু তাঁর অপার ব্যথা জীবনের একটা চূড়ান্ত বিন্দুতে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে, এক মুহূর্তের অকল্পনীয় আনন্দানুভবের পুলকিত বৃন্তে যেখানে অবিরাম আতঙ্কের কণ্টক মর্মবিদ্ধ হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথই এক সময়ে অনুভব করেছিলেন, "অলৌকিক আনন্দের ভার/বিধাতা যাহারে দেন/তার বক্ষে বেদনা অপার।" আনন্দের এ অধিকার কবিরই একমাত্র নয়, গোরার অভাবনীয় আবির্ভাবকে উপলক্ষ করে আনন্দময়ীর জীবনে নিত্য বেদনাজর্জর সেই অলৌকিক আনন্দের উৎসার! উপন্যাসের সেই চরম ঘটনাটির কথা আবার মনে করতে হয়, আনন্দময়ীর হৃৎস্পন্দন এক মুহূর্তে ঘড়ির কাঁটাটির মতো যখন থামতে বসেছিল—গোরার আত্মপরিচয় আবিষ্কারের মুহূর্তে। রুদ্ধ শ্বাসে

আনন্দময়ী তখন বলে চলেছেন, "বাপ তোকে হারাই এই ভয়ে আমি এত পাপ করেছি।"—তার ঠিক আগের মুহূর্তে গোরার তীক্ষ্ণ প্রশ্নটি তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল :— "তুমি আমাকে এত দিন বল নি কেন? বললে তোমার কোনো ক্ষতি হত না।" আনন্দময়ীর উদ্‌ভ্রান্ত মিনতির উত্তরে "গোরা শুধু কেবল কহিল, 'মা'।" আর তখনই "গোরার মুখে সেই সম্বোধন শুনিয়া আনন্দময়ীর রুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।"

এই অশ্রুপাথারকে জীবন ভোর বুক-চাপা পাথরের মতো যাঁকে বইতে হয়েছে—তাঁর আত্মনিমজ্জিত সংবৃতিকে নিস্তাপ যদি ভাবিও আপাতদৃষ্টিতে, নিষ্প্রাণ ভাববার উপায় কই! আসলে সবটুকু উত্তাপই তো মর্মে দহন করে চলেছিল ছাইচাপা আগুনের মতো!

শেষ পর্যন্ত আনন্দময়ীর উত্তরণ যদি হয়ে থাকে ব্যথাদীর্ণ, পরেশবাবুর অন্তিম উন্মোচন, তাহলে, নিগূঢ় অন্তর্বেদনা-কম্পিত। এই অ-সাধারণ ব্যথা-বেদনার ভারেই তাঁরা সহজ-মানুষের সগোত্র। রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত ভারত-ভাবনার বিমূর্ত প্রতিনিধি হয়েও ব্যক্তিত্ব-সুচিহ্নিত সজীব ঔপন্যাসিক চরিত্র।

পরেশবাবুকে উপন্যাসের অন্তিম মুহূর্তে গোরা বলেছিল, "আমি যা দিন দিন হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।...আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার অপবিত্রতার ভয় রইল না।...আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি...।"

গোরার এ অসাধারণ মুক্তি আসলে যুগ-যুগব্যাপী সম্প্রদায়-নিবদ্ধ জাতীয়তা-বোধ হতে সার্বিক—চিরন্তন ভারত-চেতনায় কবিভাবিত উত্তরণের দিশারি—ব্যক্তির জীবন ঘিরে অখণ্ড-সমগ্র ঐতিহাসিক অভীপ্সার নিভৃত ইঙ্গিতগর্ভ। তাহলেও, আগেও বলেছি,—ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মন্থন করা অভিঘাত-অভিজ্ঞতাকে সর্বজনীন প্রেক্ষাপটে উত্তীর্ণ করার—ব্যষ্টির জীবন আর সমষ্টির সংস্কারকে ওতঃপ্রোত জড়িয়ে দিতে পারার অতুল সামর্থ্যেই "গোরা"র মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস-কলাগুণ।

বিনয়-ললিতার প্রণয়কাহিনী নানা দিক থেকেই অসাধারণ ; তাহলেও সে-সমস্যা—তার সুখদুঃখ ভালোমন্দ একান্তভাবেই তাদের ব্যক্তিগত। কিন্তু গোরার চরিত্রে প্রেমের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তার সমাজ-সেবা, তার মানবহিতব্রত—তার খাওয়া-পরা পথচলা সব কিছুই 'ভারতবর্ষে'র জন্যে একান্ত সমর্পিত। অত প্রখর—অত প্রবল তার ব্যক্তিত্ব, অথচ সবটুকুই তার ভারত-ভাবনা ভরে আস্টেপৃষ্ঠে মোড়া। অন্যপক্ষে, ঐ খাওয়া-পরা পথ-চলার মতোই প্রেমও মানবিক অস্তিত্বের এক স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি। গোরা না-জেনেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ; কিন্তু জেনেশুনেও তার হাত থেকে রেহাই পায় নি। বরং তার ভারত-সমর্পিত চেতনা সেই অনিবার্য ব্যক্তিক চাহিদাকেও আপন জীবন-সাধনার পরিভাষায় নবসংস্কৃত—পুনর্জীবিত করে তুলতে পেরেছিল।

বিনয়ের বিয়ের সকালে তার অন্তর্লীন প্রেমানুভবের দীপ্তি গোরাতে সঞ্চারিত হয়েছিল। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন :—"আজকাল গোরা নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে-একটি আকাঙ্ক্ষা, যে-একটি পূর্ণতার অভাব অনুভব করিতেছে, কোনো মতেই কোনো কাজ দিয়া তাহাকে সে পূরণ করিতে পারিতেছে না। শুধু সে নিজে নহে, তাহার সমস্ত কাজও যেন ঊর্ধ্বের

দিকে হাত বাড়াইয়া বলিতেছে—একটা আলো চাই, উজ্জ্বল আলো, সুন্দর আলো। যেন আর সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত আছে, যেন হীরামানিক সোনারূপা দুর্মূল্য নয়, যেন লৌহ বর্মচর্ম দুর্লভ নয়—কেবল আশা ও সান্ত্বনায় উদ্ভাসিত স্নিগ্ধ সুন্দর অনুরাগ-মণ্ডিত আলো কোথায়। যাহা আছে তাহাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য কোনো প্রয়াসের প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহাকে সমুজ্জ্বল করিয়া, লাবণ্যময় করিয়া প্রকাশিত করিয়া তুলিবার যে অপেক্ষা আছে।"

পুরুষের কাজে অনুরাগমণ্ডিত ঐ লাবণ্য সঞ্চারের সুদক্ষিণতাবশেই নারীর আলোকময় ভূমিকা—নারীচেতনায় বীর্যবলিষ্ঠ পৌরুষের প্রদীপ্তিই যেমন বরণীয়তম। তবু গোরা-সুচরিতার সেই পূর্ণতাভিলাষের গভীরে ব্যক্তির বাসনাকে সমাচ্ছন্ন করে সামগ্রিক ব্রত-সাফল্যের উদ্দীপনাই প্রায় একমাত্র হতে চেয়েছে। উপন্যাসের অবসানে গোরার প্রসারিত হাতে হাত বাড়িয়ে সুচরিতা যে-ভবিষ্যৎকে অঙ্গীকার করে—সে এক পথে একত্র যাত্রার—সেই পরমে উত্তরণের পথ, "যিনি", গোরা বুঝেছে, "হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান-ব্রাহ্ম সকলেরই...যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, "গোরা"র এই সমাপ্তিকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বিপরীত রূপে কল্পনা করতে পেরেছিলেন,—সে খবর প্রথমে চিঠিতে লিখেছিলেন উইলি পিয়ার্সনকে ;[৩৪] পরে বলেছিলেন বনফুলকেও। বনফুল তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।[৩৫]—

হঠাৎ আত্মপরিচয় আবিষ্কৃত হবার অভিঘাতে গোরা 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়ে পড়ে, "সে নিজের ঘরে দুহাতে মুখ ঢেকে চুপ করে বসেছিল। এমন সময় সুচরিতা এসে ঢুকল। সে গোরার দিকে চেয়ে বলল—'আপনাকে আমি গুরু বলে স্বীকার করেছি। আপনিই বলে দিন আমার এ অবস্থায় কি করা উচিত। আপনি যা বলবেন তাই করব।' গোরা কোনো উত্তর দিতে পারলে না। যেমন বসে ছিল তেমনি বসেই রইল খানিকক্ষণ, তারপর কোন উত্তর না পেয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।" রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, নিবেদিতার প্রবল নির্বন্ধেই নতুন রূপটি গড়ে দিতে হয়েছিল পুরোনো গল্প ভেঙে।

বনফুলের তবু মনে হয়েছিল, ঐ পুরোনো সমাপ্তিটা বুঝি 'আরো ভালো' হতে পারত। কিন্তু শিহরিত অনুভব ভরে ভাবতে হয়, তেমনটি হলে "গোরা"র 'মহাকাব্য'ধর্মী মাত্রাটি তৎক্ষণাৎ ধূলিসাৎ হয়ে পড়ত আরো পাঁচটা উপন্যাসের মতো ব্যক্তিগত ট্রাজেডি-তে, বিনয়-ললিতার মিলনের প্রতিচিত্রটি হয়ে গিয়ে। গোরার সেই উদ্ভ্রান্তি এবং সুচরিতার অপসরণ-পটে গোরা-চরিত্রের ভারত-ভাবিত উদাত্ত এপিক মাত্রাটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়তই। বর্তমান পাঠে গোরা-সুচরিতার জীবন-পরিণামের সূত্রে ভারতপন্থায় অভিযাত্রীর নতুন সূচনা সম্ভাবিত হল। "মহাভারত"-এ মহাকাব্যর সমাপ্তি 'মহাপ্রস্থান'-এ, "গোরা"য় চিরন্তন ভারতবর্ষের সন্ধান গোরা-সুচরিতার সম্মিলিত মহাযাত্রায়।

দৈবাৎ নিবেদিতা বাধা দিয়েছিলেন ; অমন অসাধারণ মহাকাব্য-কাহিনীর শেষ রক্ষা হল তাই অনিবার্য মাত্রাহানির সম্ভাবনা হতে।

৩৪। Cf. "Visva Bharati Quarterly" : Aug-Oct 1943. p. 179

৩৫। দ্র. বনফুল—"রবীন্দ্রস্মৃতি", পৃ. ৭৩

তৃতীয় অধ্যায়

(১)

"চতুরঙ্গ" বাংলা উপন্যাসে এক নূতন রূপান্তরের দিক্-চিহ্ন ; বাঙালির ইতিহাসে বুঝি জীবনান্তরের দিশারি দলিলও। "গোরা" থেকে "চতুরঙ্গ"র ভাবনা ও রচনাকালের তফাত পাঁচ বছরেরও কম ; ১৩১৬-র ফাল্গুন মাসে "গোরার" প্রকাশ শেষ হয় "প্রবাসী"-তে, ১৩২১-এর অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন অবধি "সবুজপত্র"-তে প্রকাশিত হয়েছিল "চতুরঙ্গ"! ইতিহাসের দৃক্‌কোণ হতেও "গোরা"র পরবর্তী জীবন-কথাই সন্নিবেশিত হয়েছে "চতুরঙ্গ"-তে। তবু "গোরা" থেকে "চতুরঙ্গ" অবধি চলার পথে বাঙালি জীবন-চৈতন্য উনিশ শতকীয়তার সীমানা পেরিয়ে বিশ শতকীয় প্রবণতার জটিল আবর্তে প্রবেশ করে বসে আছে।

তাথ্যিক বিশ্লেষণের বিস্তৃত অবকাশ আপাতত নেই, প্রয়োজনও অনিবার্য নয়। মানুষের ইতিহাসের গতি সনতারিখের পাঁজি হুবহু মিলিয়ে চলতে পারেও না। তবু উনিশ শতকের বাঙালি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপাদান মধ্যবিত্ত সমাজের, সীমিত হলেও উত্তুঙ্গ, অভ্যুদয় ;—'নবজাগরণ' নামে যার অভিধা। বিত্তের তুলনায় বিশেষিত ভাবাদর্শের প্রতিই ঝোঁক ছিল তার বেশি—'সহজ জীবনযাত্রা'র সঙ্গে 'উচ্চ চিন্তা'র। উনিশ শতক এদিক থেকে বাঙালি মধ্যবিত্ত মনের মানবিক বিশ্বাসে উজ্জীবনের,—ভরসায়, আত্মপ্রত্যয়ে সংপ্রতিষ্ঠতার—ভিত্তিভূমি। অন্যপক্ষে বিশ শতক সেই মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বাত্মক ক্ষয় ও বিনাশের কাল, এমন কি মানুষের অস্তিত্ব নিয়েও সংশয়ের, হতাশার, অবিশ্বাসের অবধি থাকে নি—থাকছে না এ-যুগে। তার পশ্চাৎবর্তী অর্থ-রাজনীতি-ইতিহাসগত কারণ স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।[১] সে যেমনই হোক, "গোরা"তে উত্থান-পতনে বন্ধুর সেই নবজাগরণিক অভ্যুদয়ের তুঙ্গ-বিন্দু ;—"চতুরঙ্গ"তে অবক্ষয়ী অবতরণের, আত্মত্রাণ-সন্ধানের, মর্মান্তিক উত্তালতা।

ইতিহাসের বিশিষ্ট পদ্ধতিবশেই 'নবজাগরণ'এর সক্রিয়তা সর্বদেশকালে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ। ইতালি থেকে ইংলন্ডে তার অভিন্ন চরিত্র। উনিশ শতকের বাংলাদেশেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তাহলেও, মানব-প্রগতি এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে এই নবজাগরণিক প্রবণতার সঞ্চয় অপর যে-কোনো একটি সময়-পরিধির চেয়ে অনেক বেশি ফলবান এবং সমৃদ্ধ। বাংলা দেশের ইতিহাসেই রামমোহনের মনন, বিদ্যাসাগরের সর্বস্বপণ জীবনপ্রেম, মধুসূদন-বঙ্কিমের সাহিত্যসৃষ্টি, অবনীন্দ্রনাথের

---

১. বাংলা সাহিত্যব্যাপী এই সার্বিক বিনষ্টিচেতনার মূলগত ঐতিহাসিক কুঞ্চিকার জন্য, দ্র. ভূদেব চৌধুরী-"বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার" (চতুর্থ সং)—দ্বাদশ অধ্যায়।

চারুকলা, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বায়ত জীবন-দর্শন এবং জীবননির্মাণের অমেয় সাধনার ফলপরিণতিকে আজ ইচ্ছে করলেও ইতিহাস হতে মুছে ফেলবার উপায় নেই। কিংবা মুছে ফেলতে পারলে আপামর বাঙালি জীবনেরও উঠে দাঁড়াবার ভিতটিই অনেক হালকা হয়ে পড়তে বাধ্য। তাহলেও, একথা মানতেই হবে, উনিশ শতকের নবজাগরণ বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনকেও আশু এবং অবিরল বিনষ্টি থেকে রক্ষা করতে পারে নি। তার সবটাই বিত্তগত অপ্রতুলতার দরুন নয়। আসলে বৃহত্তর সামাজিক জীবন-প্রবাহ হতে আমূল বিচ্ছিন্নতার ফলেই ভেতর থেকে মধ্যবিত্ত জীবন বিশুষ্ক হয়ে আসছিল ;—কেবল অর্থাভাবে নয়, আন্তরিক শূন্যতা বোধেও। জীবিকার্জনের বিচ্ছিন্ন কিংবা যূথবদ্ধ আয়াস সামাজিক সম্পদের উন্নতি ও বিস্তার সাধন করতে যদি পারে, কেবল তাহলেই ব্যক্তিগত বিত্তের অক্ষুণ্ণ প্রসারও সুনিশ্চিত হওয়া সম্ভব। অন্যপক্ষে, ব্যক্তিক চিন্তা-ভাবনা-কর্মের ফসল সমাজের অঙ্গে তার সমৃদ্ধির স্বাক্ষর মুদ্রিত করতে পারলেই মানসিক জীবনের অবিচ্ছিন্নতা সুসিদ্ধ হতে পারে।

বাংলাদেশে তেমনটি ঘটতে পারে নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভৌমিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং ঔপনিবেশিক শাসন-সূচনায় লব্ধ চাকুরিজাত আর্থিক অভ্যুদয়ের প্রতিশ্রুতি অল্পদিনেই মূল অবধি জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তার একটা কারণ বর্তমান প্রসঙ্গে সবচেয়ে স্মরণীয়—সীমিত পরিসরে সেদিনকার বিত্তগত সমৃদ্ধি সামাজিক সম্পদের বিবর্ধনে নিয়োজিত হয় নি প্রায়ই। একই দশা ঘটেছিল মনোভব সমৃদ্ধিরও। ইদানীং এমন কথা শোনা যাচ্ছে, বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণ 'ঔপনিবেশিক' কার্যকারণাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলেই তার এই আত্মখণ্ডিত সংকীর্ণতা। অংশত সঠিক যদি হয়ও, তবু এ-ধরনের ভাবনা সম্পূর্ণ যথার্থ নয়। তেমন হলে, বিশ্বজোড়া পশ্চিমি দুনিয়ার বিচ্ছিন্নতাবোধের এমন মর্মপ্রদাহ সম্ভব হতে পারত না। অতি অধুনা, সাম্যবাদী রাষ্ট্রগঠনের জবরদস্ত প্রচণ্ড উদ্যমও আজ তো সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

আসল সমস্যাটা মধ্যবিত্ত 'বুদ্ধিজীবিতা'র একপেশেমিতে। যে-মানুষ জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে—একাত্ম হয়ে—বাঁচতে পারল না, সে-ই জীবনস্রোত হতে দূরে, রুক্ষ ডাঙায় দাঁড়িয়ে নিরেট বুদ্ধির স্লেটে জীবনের আঁক কষতে বসে। অঙ্ক মেলে না ; কারণ জীবনের চলা তো সহস্রধার-অস্থির ; স্থবিরতার হিসেবে তাকে ধরবার উপায় নেই। শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত তাঁদের জীবিকা এবং ভাবনা নিয়ে গোটা সমাজের চলমান জীবনধারা থেকে যতই দূর হতে দূরে চলে যেতে লাগলেন, ততই প্রাণোত্তাপের নিষ্প্রভতা দূর করতে চাইলেন জীবনের মূল্য বিবেচনায় বিচার-বুদ্ধির প্রখরতা দিয়ে। এক কালের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শহুরে সমাজের গণ্ডী তাতে আরো গণ্ডিবদ্ধ হল বুদ্ধিদর্পী হ্রস্বতার, অতি-বিদ্বদ্বত্তার সংকীর্ণ পরিসরে। এঁরা সম্পূর্ণই নিঃসমাজ মানুষ ; সমাজ-বিহীনতার যন্ত্রণা এঁদের চেতনার গভীরে দপদপিয়ে ওঠে—সদ্য জল-ছাড়া মাছটির মতো। আসলে মধ্যবিত্ত চৈতন্যের উদ্ভব সামাজিক জীবনের সর্বায়ত খাতটির বাইরে, অতএব একটা বিচ্ছেদ-চেতনা অন্তর্নিহিত হয়েছিলই তার অস্তিত্বের মূল অবধি। বুদ্ধিজীবিতার অনন্যমুখ উদ্ধারণবশে সেই চৈতন্যমন্থক অনুভবের আক্ষেপ ক্রমশ স্পষ্টাবয়ব হয়েছে। তারই চূড়ান্ত অভিব্যক্তি-সূত্রে অস্তিত্বের সংকট-চেতনা আজ মানবিক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। "চতুরঙ্গ"তে সেই বিচ্ছিন্নতা-পীড়িত আধুনিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী অস্তিত্বের সংকটবোধ

প্রথম সাহিত্য-মূর্তি ধরছে, কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, সম্ভবত গোটা ভারতীয় সাহিত্যেই।

বাংলা সাহিত্যে 'বুদ্ধিজীবী' ভাবনা স্পষ্ট-পরিণত আন্দোলনের আকার ধরেছিল "সবুজপত্র"-গোষ্ঠীর মাধ্যমেই। "সবুজপত্র"ই "চতুরঙ্গ"রও প্রকাশভূমি। তাহলেও রবীন্দ্র-ভাবনায় ইতিহাসের ক্রমানুগতিটিও এই সূত্রে লক্ষণীয়। "গোরা"র পরে "চতুরঙ্গ"। "গোরা"র শেষে দেখেছি উনিশ শতকীয় প্রত্যয়-চেতনার পরমা পরিণতি ; "চতুরঙ্গ"তে বিশ শতকীয় অবক্ষয় ও উৎপাটন-ভারাক্রান্ততার গভীর উদ্ভাস। আগেই বলেছি, গ্রাম-শহরে স্বতোবিচ্ছিন্ন ঔপনিবেশিক জীবনের সীমাবদ্ধতা, তথা মধ্যবিত্ত শহুরে নবজাগরণের আত্মখণ্ডী সংকীর্ণতা সম্পর্কে সর্বদাই রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ সচেতন ছিলেন। বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, আচরণে, জীবনের মূল খাতটির সঙ্গে নবজাগরণের শহুরে স্রোতটিকে জড়িয়ে দিতে পারার আবেদন এবং ব্যক্তিগত আয়াস ছিল তাঁর প্রথমাবধি। "স্বদেশী"র নামে নগর সেদিন গ্রামমুখী হয়েছিল, তাই দেখে উল্লসিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে—হয়ত বা নিজের অগোচরেই, এবং সেকালের অজস্র বিচ্যুতি সত্ত্বেও। "গোরা"তে সেই আজীবন প্রত্যাশার লৈখিক উন্মোচন।

কিন্তু তারপরেই সব শেষ। উনিশশতকীয় রেনেসাঁসের চূড়ান্ত উন্মোচন 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর উত্তাল অভিব্যক্তিতে ; তার অবক্ষয়ের সূচনা ঐ একই আন্দোলনের অকস্মাৎ বিপর্যস্ত অবসানে। "গোরা"র পরে ঐ মানসিকতার জীবন-বৃন্তে "চতুরঙ্গ"র উদ্ভব। পরিবর্তনের ছবিটা রবীন্দ্রনাথ ধরে দিয়েছেন 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে[২], "সবুজপত্র"র প্রথম সংখ্যাতেই তার প্রকাশ। "চতুরঙ্গ" তথা "সবুজপত্র"-যুগের সকল গদ্যপদ্য রচনার মর্মসংকেত বহুলাংশে ঐ প্রবন্ধে নিহিত।

তাছাড়াও, ঔপন্যাসিক মনোভাবনার ঐতিহাসিক প্রচ্ছদটি আরো একটু স্পষ্ট করে নেওয়া যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করে সরকারি ঘোষণা প্রচারিত হয় ; ১৯১২-র মে মাসে কবি বিদেশ যাত্রা করেন ; ফিরে আসেন ১৯১৩-র অক্‌টোবর-এ। যাবার আগে স্বদেশী উদ্দীপনার অবসান দেখে গেছেন—কিন্তু তার অমন বিভগ্ন রূপটি প্রত্যক্ষ করে যাবার অবকাশ হয় নি ; ব্যক্তি-সর্বস্ব, আত্মপর, উচ্ছিন্ন-হতাশ মধ্যবিত্ত মনোধর্মের নূতন অভিব্যক্তি স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে সময় নিয়েছিল। ১৯১৩-র শেষে ফিরে আসার পরে জীবনের ঐ চেহারা কবিমনকে চমকিত করেছিল অবশ্যই ; স্বদেশী যুগের মিলনপ্রয়াসী জীবনাগ্রহের ছবি তখনো তো তাঁর মনে ধরা! হঠাৎ পরিবর্তনের চকিত অনুভব নূতন জীবনচেতনার মূল অবধি কবির অন্তর্দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে নিয়েছিল, আর ১৩২১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯১৪ সালে "চতুরঙ্গ" রচনা শুরু হবার আগে থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিনাশী অভিঘাতেরও সূচনা হয়ে গিয়েছিল। সর্বমুখী এই ক্ষয়ক্ষতি আশঙ্কার পরিমণ্ডলে ইতিহাসের সমস্যার আন্তর পরিচয়টি খুঁজতে বসেছিলেন কবি তাঁর উদ্বেজিত অন্তর্দৃষ্টিবশে। বাইরের বস্তুমন্থন-করা জীবন-নির্যাস নয় আর, চেতনার মূল-নিহিত সংকট-চিত্রটিই এবারে অনুসন্ধেয়। 'আঁতের কথা' খুঁটিয়ে দেখার আরো এক নূতন মাত্রা। উপন্যাসের আকার-প্রকারও তাতে আমূল পাল্টেছে।

---

২. "কালান্তর"—র. র. ২৪ পৃ. ২৫২-২৬০

তার চমক বিদগ্ধ পাঠক মহলে দ্বিধা, সংশয়, উৎসাহের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া রচনা করেছিল। বুদ্ধদেব বসুও অনুযোগ করেছিলেন,[৩] "চতুরঙ্গ" থেকে উপন্যাসকে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করে নিয়েছিলেন। সৃষ্টির সকল স্তরেই তাঁর আগ্রহ ছিল অভিন্ন ; তাহলেও কাব্যের জগতেই তাঁর সৃজনী কল্পনার অবাধ বিচরণের আনন্দ! শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ধরনের 'এপিগ্রাম'-লক্ষণাক্রান্ত রচনার উপন্যাসগুণ সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৪] আবার অধুনাতন কালে অনেকে "চতুরঙ্গ"-তে চেতনাপ্রবাহ-মন্থক 'আধুনিক' শৈলীর উচ্চকণ্ঠ সংবর্ধনা করতে চান। আসলে রবীন্দ্র-উপন্যাস, তথা যে-কোনো সার্থক সৃষ্টিকেই নিছক শাস্ত্রীয় মূল্যমানের নিরিখে মাপতে গেলে হিসেবে গরমিল ঘটবেই ; মৌল প্রেরণাবহ জীবনের চারিত্র-সূত্রেই কেবল নির্ভুল পরিমাপ-যন্ত্রটি গড়ে উঠতে পারে। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে ঐখানে "চতুরঙ্গ"র দিগ্‌দর্শীর ভূমিকা।

বস্তুত, সম্পূর্ণ নিঃসমাজ হয়ে পড়লেও মানুষের চেতনার গহন হতে তার 'সমাজ'-প্রত্যাশী সত্তার আগ্রহকে উন্মূলিত করে ফেলার উপায় তো নেই। স্বভাব বশেই মানুষ 'সামাজিক জীব'। সমাজ অর্থে 'যূথবদ্ধতা' বুঝব না একেবারেই ; গহন অরণ্যে দলপাকিয়ে-চলা হাতির পাল মুহূর্তে কেমন আত্মনাশী উন্মত্ততায় মেতে ওঠে! সামাজিক চেতনা আসলে মনোভব ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায়[৫] মানুষ যেখানে "মনে মনে মিল চায়, মিল পায়, মিল না পেলে হয় অকৃতার্থ।" মানুষে-মানুষে মেলার সেই ভিতটি যেখানে সম্পূর্ণ বিচলিত, সেখানেই মনের ভেতরেই চলে তার অন্তর্নিরুদ্ধ অক্ষেপ আলোড়ন ; জেনে কিংবা না জেনেও। তেমন অবস্থায়, চেতনা-অবচেতনার মন্থনে গড়ে ওঠা সেই আত্মিক উদ্বেজনার যোগফলই হল গোটা জীবন।

কিন্তু সে-জীবনের রূপ রচনা এক দুঃসাধ্য সাধন। ইন্দ্রিয়চেতনার সীমায় যা স্পষ্টত উপস্থিত নয়, অথচ মর্মের গহনে যার অভিঘাত নিরন্তর, বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাষায় তাকে উন্মোচিত করার সমস্যা দুরপণেয় হয়। আবার সে সমস্যারও মাত্রাভেদ রয়েছে ; তারই অনুসারে সমাধান-প্রয়াসেরও তারতম্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি গদ্যে-পদ্যে সর্বত্র ছিল একেবারেই মূলানুসারী ; অন্তশ্চৈতন্যের তলদেশ অবধি পৌঁছে জীবনের সামগ্রিক সত্য পরিচয় খুঁজে ফেরা তাঁর ধর্ম।—'ইনার কনশাসনেস' কথাটা একালে বিদেশী সাহিত্যে অতিপ্রচলিত ; রবীন্দ্র-ভাবনাকে সে 'বৈজ্ঞানিক' মানদণ্ডে মাপতে গেলেও বুঝি তার সামগ্রিকতার রহস্য অনেকটা ফিকে হয়ে যায়। অন্তশ্চৈতন্য হতে পরাচৈতন্যে তাঁর ভাবনার অবাধ অভিসার ; 'ইনার কনশাসনেস' থেকে, যদি বলি, 'কসমিক কনশাসনেস'-এ! বহুলাংশে সেই অতীন্দ্রিয় চৈতন্যের উদ্ভাসটুকু ইন্দ্রিয়-নির্ভর বোধ-বুদ্ধির দরবারে পৌঁছে দিতেই উপন্যাসে নতুন প্রকাশের শৈলী, ভাষায় বাগর্থবন্ধনের নূতন মাত্রা খুঁজতে হয়েছে শিল্পীকে।

প্রসঙ্গত প্রথমনাথ বিশীর অনুযোগের ভাষাটি মনে পড়ে[৬], "...লেখকের প্রতিভা অনন্য-

৩। দ্র. বুদ্ধদেব বসু—"রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য"—পৃ. ৫৭

৪। দ্র. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—"বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" (২য় সং) পৃ. ১৪৩-১৪৪

৫. দ্র. "মানুষের ধর্ম"র. র. ২০. পৃ. ৩৭৩

৬। প্রথমনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত (সঃ)—"বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক" : 'ভূমিকা', পৃ. ১৭৯-৮০

নির্ভর নয়, ভাষার ও সমাজের সীমাই তার সীমা। যখন সেই সীমাকে সে বাড়িয়ে দেয় ভাষা ও সমাজের সহযোগিতাতেই দেয়, ভাষার শক্তিকে ও সমাজের সহযোগিতাকে কতকদূর পর্য্যন্ত প্রতিভাবান্ ব্যক্তি টেনে নিয়ে যেতে পারে—অনন্তকাল পর্য্যন্ত পারে না।...[রবীন্দ্রনাথের] একেবারে শেষ জীবনের রচনা, যেমন শেষের কবিতা ও তিন সঙ্গী পড়তে পড়তে অনেক সময়ে মনে হয় যে দুর্বল ভাষার মেরুদণ্ডের উপরে অত্যন্ত বেশি চাপ দেওয়া হয়েছে।...অমিতের হাত দিয়ে নিজের গদ্যরীতিকে চাবকে নূতনতর চালে চালাবার চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর মতো প্রতিভাবান ভাষার হাড়হদ্দ সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তি জানতেন যে এমন করে বেশিদূর চাবকে চালানো যায় না, ভাষার সহিষ্ণুতার উপরে অত্যাচার হয়। তাই তিনি ভাষাকে ছেড়ে রেখাকে ধরেছেন। তাঁর ছবি তাঁর সাহিত্য রচনারই অনুক্রম ; লেখার যেখানে শেষ, রেখার সেখানে আরম্ভ।"

সর্বাংশেই এ-বক্তব্য অবিতর্কিত নাও হতে পারে। তাহলেও দুটি সংকেত প্রণিধানযোগ্য :—(১) গল্প-উপন্যাসে ভাষার ভেতর দিয়ে যে-বাণীকে চালনা করা হচ্ছে, সমাজে তার প্রত্যক্ষ প্রেরণা অনুপস্থিত ; (২) আর সেই কারণেই লেখায় রেখার চরিত্র সঞ্চার করতে হয়েছিল। রবীন্দ্র-চিত্রে অবদমন-মর্দিত অবচেতনার অভিক্ষেপ নিয়ে তর্ক অবিরল হতে পারে, কিন্তু চৈতন্যের তলনিহিত বিস্রস্তরূপ রহস্যাবরণকে ভাষার মাধ্যমে রূপাশ্রয়ী চেতনার উপরিস্তরে উদ্ভাসিত করতে চিত্রধর্মী সংকেত অনিবার্য হয়। বচনাতীতকে রেখাবদ্ধ করতে গিয়ে ভাষার চরিত্র সেখানে বাগর্থের বন্ধনাতিশায়ী তির্যক ব্যঞ্জনায় চকিত হয়ে ওঠে! "চতুরঙ্গ" থেকেই এই নূতন শৈলীর উদ্ভব—কারণ নবজীবন-চেতনার চাপ ঐখানেই বোধগম্যভাবে প্রথম অনতিক্রমণীয় হয়েছে।

শচীশ-দামিনীর গুহা-যাপনচিত্রের কথাই ভাবা যেতে পারে। গুহার আকারটিও কি প্রতীকী নয়? 'ডায়ারি'তে শচীশ লিখেছিল—"সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো—তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে।" পাগলের মতো শচীশ ছুটে বেরোতে চেয়েছে সেই শ্বাসরোধকর জান্তবতা হতে। নীরন্ধ্র অন্ধকারে অজস্র বিসর্পিল বাধার হাত অতিক্রম করতে না পেরে সে বলেছে, "...ফিরিয়া আসিয়া কম্বলটার উপর শুইলাম। মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তাহার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালোক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।"

শচীশ অস্থির মনে ভাবছিল 'জাগ্রৎ চৈতন্যে' এ-যন্ত্রণা সওয়া যায় না ;—তার 'চেতনা'র ওপরে ক্রমশ 'আসাড়তার পাতলা চাদর' ঢাকা পড়ে গেল। তেমন সময়ে হঠাৎ শচীশের মনে হল 'পায়ের ওপরে সেই জন্তুটা'!

সব মিলে শচীশের মনশ্চেতনার পুরো ছবিটি এখানে পূর্বাপর অর্থের পারম্পর্যে অনুধাবনেরও অতীত। সে-রাতের ঐ বিভীষিকাবাহী ঘটনা-প্রবাহকে কি বলে ব্যাখ্যা করা চলে? হয়ত মোটেই চলে না ; কারণ নরনারীর বিভেদ-মিলন-আন্দোলনের সকল চেনা গণ্ডীকে সে অতিক্রম করে বসে আছে, অথচ সব মিলে জীবনের এমন গাঢ় প্রদাহকর উত্তাপ আর কোথায় মিলেছে—তার আগে!

আসলে "চতুরঙ্গ"র ভাষা কাব্যজগৎ-বিলম্বী নয়, "চতুরঙ্গ"র জীবন বহিরঙ্গ বাতাবরণ

হতে আমূল বিচ্ছিন্নতার তাড়নায় অন্তঃসার-সর্বস্ব হয়ে পড়েছে ; তারই সারাৎসার-সঞ্চয়ী উপন্যাসের সামগ্রিক প্রকাশভঙ্গী। সমাজ-পরিচ্ছিন্ন মানুষের ব্যক্তি-চৈতন্য যেখানে অন্তর্নিরুদ্ধ সামাজিক সত্তার চাপে সর্বত পর্যুদস্ত, "চতুরঙ্গ"তে সেই জীবনচরিত্রের বস্তুচেতনাধৃত রূপ। এ সত্য জেনেই উপন্যাস-কথার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত অনুসরণ করে দেখা যেতে পারে এবারে।

গল্পের কাল গল্পের ভেতরেই ধরা আছে। "যে-বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল". সেই বছরেই নিরাশ্রয় প্লেগ রোগীদের সেবা করতে গিয়ে 'জ্যাঠামশায়' জগমোহন দেহত্যাগ করেন। সে ১৮৯৮ সালের কথা। শচীশ তখন বিশ্ববিদ্যালয়-উত্তীর্ণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে-বাইরে বুদ্ধিজীবী তারুণ্যের মুখ্য আগ্রহের বিষয় ; অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্দ্ব তাকে নিয়ে উত্তাল। 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদে'র তকমাধারী শ্রীবিলাসও বুদ্ধিজীবিতার উজ্জ্বল রত্ন। এই বুদ্ধিজীবিতার বোধ অব্যহিত কালচরিত্রকে ছাপিয়ে গেছে নিঃসন্দেহে ; সে-কথায় আসছি পরে।

উনিশ শতকের শহর-কলকাতার বাতাবরণটি প্রারম্ভাংশে উপন্যাস-দেহে স্বচ্ছন্দ। পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি-সম্ভব অচল বিত্তের বদ্ধতায় উত্তরসূরী নিষ্কর্মা মধ্যবিত্ত জীবনের আমূল পচনশীলতার এক জ্বলজ্যান্ত ছবি হরিমোহন ও তার পরিবার। জগমোহন সেকালেরই মানবপ্রেমী বিদ্যুৎ-গর্ভ নব্যবঙ্গের প্রবীণ পরিণত রূপ। নাস্তিকতা নানারূপে সেদিন চরিত্রদীন নির্জীব আস্তিকতার প্রতিক্রিয়া-সূত্রেও অগ্নিমূর্তি ধরেছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চেতনায়। রামতনু লাহিড়ী থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত সেকালের সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বই কোনো-না-কোনো সময়ে তার টানে বাঁধা পড়েছিলেন। আর নাস্তিক-আস্তিক নির্বিশেষে 'প্রত্যক্ষবাদ' 'হিতবাদ'-এর আদর্শের একটা ব্যাপক আকর্ষণ নবজাগরণিক শহুরে সমাজের প্রায় সকল স্তরেই অনিবার্য হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্মতত্ত্ব"-"অনুশীলনতত্ত্ব" কিংবা "দেবীচৌধুরাণী"তেও তার অক্ষয় স্বাক্ষর। জগমোহনের 'গরজটা'ও ছিল 'প্রচুরতম লোকের প্রচুরতম সুখ সাধনে।' তাহলেও ধর্মবিদ্রোহীর অন্তঃকরণে মনুষ্যধর্মের উদাত্ত অভিব্যক্তির যে প্রখর চিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, সেই সূত্রে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যর ঐতিহাসিক চরিত্রের কথা মনে আসতেই পারে। জ্যাঠামশায়ের জীবন-সংগ্রাম এবং তাঁর অভিভূতিকর জীবনাবসান গল্প-নির্দিষ্ট সময়-সীমার অন্তর্বর্তী হতে বাধা নেই—এমন কী ননীবালার লাঞ্ছনা হতে অকল্পনীয় মৃত্যুবরণ পর্যন্তও।

কিন্তু শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের জগতে পৌঁছালেই গল্প আর তার সাবেক কালের চৌহদ্দিতে ধরে না। নিঃসন্দেহে এ-কাহিনী উনিশ শতক ছাপিয়ে বিশের সীমানাতেও অনুপ্রবেশ করেছে ; জগমোহনের মৃত্যুর দুই বছর পরে শচীশের গল্প শুরু হতে পেরেছে আবার। কিন্তু "চতুরঙ্গ"র মূল সমস্যা আরো এগিয়ে এসেছে তার রচনা-সমকালীন বুদ্ধিজীবী তরুণ মনের অনিবার্য সংকট-চেতনার মূলে। প্রথমনাথ বিশীর পূর্বোক্ত অনুযোগ সূত্রেই জিজ্ঞাসা করা চলে, ননীবালাকে চিনি ; পুরন্দর, হরিমোহন, এমনকি জগমোহনও অচেনা নয় ; কিন্তু দামিনী 'কোন্ কাননের ফুল'—কোন্ দেশকাল-বিন্যস্ত জীবনের বৃন্তে তার ঐ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের উৎসার! ব্যক্তিক সমস্যাটাই এবার হতে প্রায় একমাত্র হতে চেয়েছে—রবীন্দ্র-উপন্যাস রচনার এই তৃতীয় পর্যায়ে। সন্দেহ নেই, ব্যক্তির 'আঁতের কথা'ই রবীন্দ্র-উপন্যাসের চিরকালের উপজীব্য ; "গোরা" পর্যন্ত ছিল সামাজিক ব্যক্তিত্বের

প্রসঙ্গ ; "চতুরঙ্গ" থেকে নিঃসমাজ ব্যক্তির। আর ঐ ব্যক্তিত্বের মান ও মাত্রা নিয়েই জীবনের দেশকালগত পরিচয়।

জগমোহনের মতো শচীশ-শ্রীবিলাসও গল্পের হিসেবে উনিশান্ত-প্রারম্ভ-বিশের শতকের পারিপার্শ্বিকতায় লালিত ; কিন্তু তাদের ব্যক্তিক যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্য তাদের অস্তিত্বকে ছিটকে দিয়েছে আরো পরবর্তী সময়ে—অঙ্কের হিসেবে সে পাঁচ-দশ বছরের কথা ; জীবনধর্মের মাপে যুগান্তরের।

দামিনীর কথাতেই ফেরা যাক। উপন্যাসে তার আবির্ভাব গল্পানুসারে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের পরে। ১৮৯৮-এ জগমোহনের মৃত্যু ; তার দুবছর পরে শ্রীবিলাস শচীশের সন্ধান পেয়ে চাঁটগায়ে লীলানন্দ স্বামীর আস্তানায় পৌঁছেছিল। ধীরে ধীরে সেখানে শ্রীবিলাসও 'আইডিয়া'র 'নেশা'য় জীর্ণ হয়ে এসেছিল। সে কয়েকমাসের ঘটনা—কিংবা একটা বছরেরও হতে বাধা নেই। তাহলেও দামিনী আসলে উনিশ শতকেই তরুণতাপ্রাপ্ত ; তার বৈধব্যও গল্পকালের হিসেবে ঐ শতকেই। কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের দাহ এবং উত্তাপ বিশশতকীয়তার শায়কবিদ্ধ।

বাঙালির ইতিহাসে, আগে দেখেছি, অবক্ষয়-অবসন্নতার প্রকট প্রকাশ 'স্বদেশী' চেতনার বিনষ্টিকাল হতে। শহুরে মধ্যবিত্তের আর্থিক দীনতা এবং তার অনুষঙ্গী মানসিক হীনতার ক্রমাগত চিত্র স্পষ্ট রূপ ধরে রয়েছে উনিশ শতকের ভালোমন্দ অজস্র প্রহসনের পাতায়। কিন্তু সেই অবিরল বিনাশের চারপাশেও একটা রুপোলি পাড় ছিল, শিক্ষিত তারুণ্য যেখানে মহৎ আদর্শের উদ্দীপনা,—পরাধীনতার পীড়াবোধে উজ্জীবিত। এমন কথা শোনা গেছে, সুরেন্দ্রনাথ যদি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত না হতেন, কিংবা যদি দ্বিতীয় বারে বিলেত হতে ব্যারিস্টারির সনদটাও নিয়ে আসতে পারতেন, তাহলেও 'স্বদেশী'-র আগুন অত দ্রুত—অত ব্যাপক হয়ে জ্বলত না হয়ত। কিন্তু তার পাশে বিপিন পাল-শিবনাথ শাস্ত্রীদের স্বাধীন জীবনযাপনের অগ্নিহুত প্রতিজ্ঞাটির কথাও ভোলবার উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত 'রাষ্ট্রগুরু' অবশ্য 'নাইটহুড'ই বরণীয় বিবেচনা করেছিলেন।

হঠাৎ যখন বিনা জিজ্ঞাসা, বিনা বোঝাপড়ায় ১৯১১-তে দিল্লি-দরবারের ঘোষণাবলে ভাঙা বাংলা জোড়া লেগে গেল, তখন হতেই অতদিনের অমন জীবনপণ জাতীয় উদ্দীপনা আর উজ্জীবন মুহূর্তে নিরর্থক হয়ে পড়ল ; শাসনযন্ত্রের আনুগত্য ছাড়া এক কালের শাসন-বিরোধীদেরও গত্যন্তর রইল অল্পই। পুরোবর্তীরা অনেকেই নিজেদের অস্তিত্বের সংগতি এবং সার্থকতা বজায় রাখতে ব্যস্ত ; সহস্র সহস্র তরুণ অনুগামীর দল, স্কুল-কলেজ-বৃত্তি ছেড়ে যারা 'স্বদেশী'র ঝড়ে ঝাঁপিয়েছিল, হঠাৎ নৈষ্কর্মের অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তারা। মধ্যবিত্ত সামাজিক অস্তিত্বের অমন চূড়ান্ত বিড়ম্বনা ছিল কল্পনাতীত। চারদিক থেকে অস্তিত্ব নিয়ে নিছক বাস্তবিক নয়, একটা নৈতিক সংকট শিক্ষিত তারুণ্যের চেতনাকে বাইরে আড়ষ্ট, এবং ভেতরে অর্ন্তভেদী করেছিল। সেই মর্মান্তিক অন্তঃসন্ধানের আক্ষেপই দামিনীর চেতনায় ছড়ানো ; তারই নিরন্তর তাড়নায় শচীশ শেষ পর্যন্ত দিশেহারা।

এই ভাবনা—এই চেতনা ও যন্ত্রণা, স্বদেশী-সমুত্তর কালের আবহাওয়ায় উপ্ত ; প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে তার স্পষ্ট প্রকাশ—"কল্লোল"-আন্দোলনে যার সাহিত্য-সঞ্চিত ঐতিহাসিক স্বাক্ষর। 'আন্দোলন' অর্থে প্রতিদ্বন্দ্বী বিচিত্র-ভাবনাধারার সকল বিক্ষেপই সামগ্রিকভাবে

বিবেচ্য[৭] ; কবিভাবিত সেই জীবনচরিত্রের সারাৎসারই "চতুরঙ্গ"তে সংগৃহীত।

শিবতোষের সঙ্গে দামিনীর দাম্পত্যের অভিজ্ঞতাটি বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে যে-কোনো কালের পরিচিত ঘটনা। কিন্তু লীলানন্দ স্বামীর প্রতি তার আচৈতন্য বিমুখতাও যদি গল্পকালের নারী-ব্যক্তি-মানসিকতার সহজ প্রতিক্রিয়া বলে মেনে নেওয়া চলে, তবু শচীশকে কেন্দ্র করে তার অমন তীব্র আত্মোৎক্ষেপ তো হালের কালের ঘটনা ; বিশ শতকীয়তার মর্ম-যন্ত্রণা যখন ব্যক্তিত্বের চেতনা-নিবদ্ধ হতে পেরেছে!

আর শচীশ তার ডায়ারিতে লিখেছিল :—"ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি—অপবিত্রের কলঙ্ক যে-নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি ; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক।" নারীচরিত্রের এই রূপসমুদ্ভাস পুরুষের যে চেতনাতে প্রতিফলিত, সে-ও হালের কালের ফসল, বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবিতায় খচিত।

সমাজের বহিরবয়বে কোথাও সে-চেতনার সংস্থান নেই। ছবিটা রবীন্দ্রনাথ সেকালের প্রচ্ছদে চিরকালের মতো এঁকেছেন। শ্রীবিলাস ইংরেজি বক্তৃতায় অনর্গল—ওদের সকল বিদ্যাই ইংরেজি-জীবী ; দেশের জীবনের সঙ্গে তার যোগ কদাচিৎ। এমন কি যে চামার দলের উন্নয়ন চেষ্টায়, কিংবা যে-প্রথম মুসলমানটির প্লেগ রোগের সেবায় জগমোহন দ্বিতীয়তম বলি হলেন নিজে, তাদের সঙ্গেও এঁদের একাত্মতা প্রত্যক্ষ ছিল না কোথাও। এমন নয় যে, শহুরে বাবুর মতো 'ছোটলোক'দের দয়া করতে চেয়েছিলেন জগমোহন ; বরং মানবিক সহৃদয়তাবশে সর্বদাই তিনি ছিলেন সসম্ভ্রম। কিন্তু সে সম্ভ্রম, সে সহৃদয়তার সবটুকুই কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠিবদ্ধ প্রত্যক্ষ মানুষের সম্পর্কে নয়—'মানবতা' নামক আন্তরিক 'আইডিয়া'র প্রতি একান্ত সমর্পিত। ছবিটা স্পষ্ট হয় ননীবালার ঘটনা প্রসঙ্গে ; তার বিরুদ্ধে অমানুষী নির্যাতনের প্রতিবিধান কামনা করেই শচীশ তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ; জগমোহন তাকে গ্রহণ করেছিলেন মেয়ে-মার ভূমিকায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো মাপই টেঁকে নি। একটা কথা স্পষ্টই বোঝা গেছে—মানব-মহিমার আরাধনা জগমোহনের মতো ধর্মবিরোধীর একমাত্র ধর্ম, অথচ মানব জীবনের তিনি কেউ নন—ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় যে জীবনের সজীব স্রোত নিয়ত বহমান।

আরো অনেক বেশি জীবন-বিচ্ছিন্ন লীলানন্দের উদ্দাম উন্মূলিত ভক্তি-বিলাস। তার ঔপন্যাসিক চিত্রণে গল্প-সমকালীন সমাজের অন্ধ গুরুবাদ-বিভ্রমের অভিজ্ঞতা যেমন ছিল—"গোরা"র প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে সে-কথা বলেছি—তেমনি ছিল তার রবীন্দ্র-মনোমন্থিত ভাবনানুভব[৮] :— "যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে/ মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে/ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা/উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা/নাহি

৭। এই আন্দোলন-চরিত্রটির ছক ধরা আছে বর্তমান লেখকের "বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার" (চতুর্থ সং) গ্রন্থে। দ্র. দ্বাদশ অধ্যায়।

৮. "নৈবেদ্য" ৪৫ সংখ্যক কবিতা, র. র. ৮, পৃ ৪০

চাহি নাথ।" শূন্যগর্ভতার,—দুরন্ত বেগে চলমান জীবনের এই নিরবলম্বন নিঃসহায়তার ছবি উৎকট হয়ে উপন্যাসে দেখা দিয়েছে নবীনের প্রথমা স্ত্রীর আত্মনাশনে। শচীশকে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী প্রশ্ন করেছিল দামিনী, "...তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন?...তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে?...এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?"

এ-জিজ্ঞাসা, যাকে বলি 'হালের কাল',—তারই ; বিশশতকীয় চেতনাহত জীবনের জিজ্ঞাসা জগমোহনের কালের পত্রপুটে এ ধরবার নয়। ঐ জিজ্ঞাসারই টানে, অবশেষে, জীবনের সঙ্গে মেলার দুর্মর আগ্রহ ; অন্তশ্চৈতন্যের রন্ধ্রেরন্ধ্রে যে জীবনের চাপ প্রতি পদে ; অথচ সামাজিক প্রচ্ছদে যার সঙ্গে যোগাযোগের পথ অব্যাহত নেই একেবারেই। এবং তাহলেও, অন্তর্দাহটা প্রত্যক্ষ, জ্বলন্ত এবং বাস্তব। রসলোক হতে শচীশের প্রত্যাবর্তন 'সাধনা'র প্রসঙ্গে শ্রীবিলাস বলেছিল, "আর ভাবসম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।" শ্রীবিলাস স্পষ্ট বুঝেছে "এ আলেয়ার আলো নয়, এযে আগুন।" তাই সে বলে, "শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চেলাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন্ ভূতের বিশ্বাসে ইহার আদি কোন্ অদ্ভুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ত তাহা লইয়া হার্বার্ট স্পেন্সরের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কী হইবে—স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে—তার জীবনটা একদিক হইতে আর একদিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।" হার্বার্ট স্পেন্সার সম্পর্কে রবীন্দ্র-মনের আনুকূল্য এ-প্রসঙ্গে সবিশেষ স্মরণীয়।

কিন্তু আসলে এই জাজ্বল্যমানতার টানেই শ্রীবিলাস-দামিনীও জীবনকে খুঁজেছে নূতন যোগাযোগের মধ্যে। তাদের মিলিত জীবনযাত্রা যথারূপে মুঞ্জরিত হতে পেল না কালের হাতে ; শচীশের আত্মত্রাণের সাধনা পূরণ হবে কবে—কখনো হবে কি না, সেই অন্তিম জিজ্ঞাসার অনিশ্চিত পাথারে শেষপর্যন্ত ভাসমান "চতুরঙ্গ"র গল্প-পরিণাম। শচীশ শ্রীবিলাসকে বলেছিল, "আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না-হয়, তবে তাহা মারে, বাঁচায় না।"—এখানে রবীন্দ্রনাথ আবারো বলতে পারতেন,—প্রথম বয়সের সেই পুরোনো কথা নতুন প্রসঙ্গে ঘুরিয়ে[৯]—"ধর্ম বলিতে রিলিজিয়ন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র।"

আসলে উপন্যাস-কথায় গল্প-কাল আর রচনাকালের জড়াজড়ি ঘটেছে ওতঃপ্রোত ভাবে। 'জ্যাঠামশায়'-এর গল্পটা, আগেও বলেছি, উনিশ শতকের উপান্তে শেষ হয়েছে কলকাতার নাগরিক সমাজের সীমায়। তারপরেই গল্পের পায়ের তলায় সামাজিক ভিত টলতে শুরু করেছে। লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে শচীশকে নিয়ে গল্প দ্বিতীয় উদ্যমেই চট্টগ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কলকাতা হতে আবার যখন লীলানন্দ সদলবলে প্রব্রজিত হলেন, সে কোন্ নামহীন দেশে—কোথায় সে সমুদ্রতীর যার অন্তরীপবদ্ধ গুহাতলে শচীশ-

৯। 'সমাজভেদ', "স্বদেশ"—র. র. ১১ পৃ. ৪৮৫

দামিনীর নৈশ অভিঘাত! কিংবা, দ্বিতীয়বারে যখন শ্রীবিলাস-দামিনী ঘর বাঁধল গিয়ে জগমোহনের বাড়িতে, সেখানে পুরোনো কর্মধারার পুনরুজ্জীবন সত্ত্বেও পুরোনো জীবনের সচ্ছন্দ চলাচল কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে ততদিনে—যে-জীবনের প্রাণোত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিল হরিমোহন-পুরন্দর-ননীবালাদের সংঘর্ষ-সংঘট্টেও।

'জ্যাঠামশায়'-এর গল্পকাল হতে 'শচীশ'-'দামিনী'-'শ্রীবিলাস'-এর গল্পকাল যুগান্তরবর্তী; শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সমাজ-বিবিক্ততার জগৎ হতে বুদ্ধিজীবী নাগরিক মনের নিঃসমাজ শূন্যতাবোধের সীমানা অবধি। 'জ্যাঠামশায়'-এ যে জীবনের সূত্রপাত ; কিন্তু কেবল জীবনের নয়, গল্পেরও নোঙর উৎপাটিত হয়েছে তার জীবনান্তের সঙ্গে। তবু ঐ অধ্যায়েই নিঃসমাজ বুদ্ধিজীবী উদ্‌ভ্রান্তি আর তার মর্মান্তিক আত্মখণ্ডনের ঐতিহাসিক পূর্বসূত্রটুকু উজ্জ্বলতম বর্ণে স্বাক্ষরিত—নবজাগরণের উৎস হতে বিনষ্টির আবর্তসীমা পর্যন্ত বহমান জীবনের সম্পূর্ণ খাতটি। ঐ কঠিন মাটির ভিতটুকুই পরবর্তী উন্মার্গগামী জীবন-যন্ত্রণাকে বিশ্বাসযোগ্য নয় কেবল, রক্তমাংসের উত্তাপ-আলোড়নে মথিত করেছে। ভাষা সম্পর্কিত পূর্বোক্ত বিবেচনায় প্রমথনাথ বিশীর অনুযোগটা—প্রধানত "শেষের কবিতা" "তিনসঙ্গী" সম্পর্কিত হলেও, আসল বক্তব্য হল, গল্পের সমস্যা সমাজের মূল হতে উৎসারিত নয়। আসলে, মানুষগুলো যে সব সমাজ-ছাড়া—সমাজ হতে ছিটকে পড়া! ঐ নিঃসমাজ বুদ্ধিজীবীদের যন্ত্রণাবোধের সামবায়িক চাপটিকে অস্বীকার করবার উপায় কোথায় জীবন এবং জীবন-জিজ্ঞাসু শিল্পীর পক্ষেও? যে-যন্ত্রণার ফুল চৈতন্যের গহনবনে জীবনের গাছটি শুদ্ধ অন্তর্লীন হয়ে পড়েছে, তার শেকড় যে-মাটিতে আটকানো রয়েছে, তাকেই চোখে দেখি 'জ্যাঠামশায়' অধ্যায়ে। ঐখানে ঐ প্রথম অধ্যায়ের বিস্তৃত, কিন্তু সুবিন্যস্ত উপস্থাপনের শিল্পমূল্য।

অধ্যায়-বিভাগের প্রসঙ্গেই উপন্যাসের গঠনের কথাটিও মনে আসে। "চোখের বালি" কিংবা, তার আগে হতেই দেখেছি, রবীন্দ্র-উপন্যাসের গঠন চরিত্র-প্রধান ; ঘটনার চেয়ে মানুষের প্রতিই শিল্পীর ঝোঁক প্রবল। এখানেও তাই। কিন্তু চরিত্রের বদলে, টানটা এখানে ব্যক্তিত্বের উন্মোচনের প্রতিই ঐকান্তিক। জীবনের চলমান ঘটনাধারা এবং ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার টানা-পড়েনের কার্যকারণে পরম্পরাবদ্ধ হয়ে গড়ে ওঠে উপন্যাসের চরিত্র। যেমন গড়তে দেখেছি নিটোল হয়ে "চোখের বালি"তে ; কিংবা যেমন গড়তে পারে নি "নৌকাডুবি"তে। "চতুরঙ্গ"তে মুঠো করে ধরবার মতো ঘটনা যা-কিছু, সে-ঐ 'জ্যাঠামশায়' অধ্যায়েই। সেখানে জগমোহন-হরিমোহন, পুরন্দর-ননীবালা, এমন কি শচীশেরও একটা চরিত্র, রেখা-সংহত হতে পেরেছে,—পারিপার্শ্বিক সমাজ-প্রবুদ্ধ ঘটনাধারা এবং তার বিভিন্ন ব্যক্তিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পারম্পর্যে। কিন্তু তার পরেই ঘটনা,—তথা সামাজিক যোগাযোগের সূত্রটি সম্পূর্ণ হারিয়ে যেতেই, জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সবটুকুই উৎসারিত হয়েছে ব্যক্তির অন্তশ্চেতনা মন্থন করে। চরিত্র বিকাশের ধারাটি আর লক্ষ করবার উপায় রইল না—ক্ষণে ক্ষণে কেবল গুহায়িত চেতনার বহিরঙ্গীণ বিক্ষেপ-বিভঙ্গ একের পর এক ; যার ক্রমানুগতির চিহ্ন প্রায়শই অদৃশ্য।

দৃষ্টান্ত হিসেবে অনায়াসে মনে করা যেতে পারে 'জ্যাঠামশায়'-এর তিরোভাবের পরে শচীশের লীলানন্দ-লগ্ন হওয়ার কাহিনী। প্রথমোক্ত দুর্ঘটনার অমেয় চাপে শচীশের চেতনাকে স্তব্ধ অসাড় করে তোলাই ছিল স্বাভাবিক এবং সম্ভব। এ-বিষয়ে কোনো সংশয়ের

কারণ একেবারেই নেই। কিন্তু যে কার্যকারণ-পরম্পরার সূত্রে দ্বিতীয়োক্ত ঘটনাটি ঘটতে পারল—যা অসম্ভবেরও বাড়া আপাতদৃষ্টিতে, তার কোনো ইঙ্গিতও নেই আগাগোড়া কাহিনীতে। প্রথানুগত মূল্যচিন্তনের কাছে এ-ঘটনা "চতুরঙ্গ"র উপন্যাসগুণের দুর্বলতারই সূচক। কিন্তু জীবনের চলমানতার সঙ্গে শিল্প-চরিত্রের বিবর্তনের প্রসঙ্গ এখানে অবশ্যই স্মরণ করতে হয়।

সমাজ-সংস্থার আবহমান একচ্ছত্রতার ওপরে উদীয়মান স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের নতুন দাবির চাপ যেখানে জীবনের পুরোনো ভারসাম্য বিস্রস্ত করে দিয়েছিল, তারই সর্বাত্মক আলোড়ন নিয়ে উপন্যাস-কলার জন্ম। ধীরে ধীরে সেই টানা-পড়েনে সমাজ যখন উপজীব্য জীবনের পশ্চাৎপটে চলে গেছে, ভারসাম্যহীনতার সবটুকু চাপই তো ব্যক্তিত্বের গভীরে অনুস্যূত হয়ে পড়ে তখন! সন্দেহ নেই, মানুষের সামাজিক সত্তার অভিক্ষেপও তাতে ব্যক্তি-চৈতন্যের অন্তর্লগ্ন হয়ে পড়ে। অথচ বহির্জীবনের কার্যকারণগত মাত্রায় সে জীবনালোড়নের হিসেব চলে না। জ্যাঠামশায় থেকে লীলানন্দ পর্যন্ত শচীশের অভিযানের বিন্যাসরীতি নতুন জীবনে পুরাতন হিসেব-নিকেশি চেষ্টার অন্তঃসারশূন্যতাই কেবল প্রতিপন্ন করে—ঐখানেও "চতুরঙ্গ"র গঠনবৈশিষ্ট্যের নিজস্ব এক কুশলতা।

তাহলেও এ-পর্যন্ত ঘটনার একটা যুক্তিগ্রাহ্য সমর্থন খুঁজে পাওয়া অন্তত অসম্ভব নয়। ভাবাই যেতে পারে, নিরাবেগ যুক্তি-সর্বস্বতার পথ হতে অকল্পনীয় অভিঘাত শচীশের চেতনাকে টেনে নিয়েছিল ভাবালু রস-নেশাতুরতার আবর্তে—বানের নদী যেমন নিজেকে তোলপাড় করে এপার ভেঙে ছিটকে নিয়ে যায় ওপারের গায়ে ধাক্কা দিতে। কিন্তু ঐ গুহা-রাত্রির ঘটনা নয় কেবল—গুহাবদ্ধ শচীশের চেতনালোড়ন! তার রহস্যজাল বহিরাগত সকল কার্যকারণ বোধেরই সীমানা ছাড়া। জ্যাঠামশায়ের অনুসরণে ঐকান্তিক আসক্তির তললীন ক্রমপুঞ্জীয়মান অতৃপ্তির তলানিভার, আর লীলানন্দের বিলাস-উল্লাসের অন্তর্বদ্ধ অবসাদ-পীড়া—অবচেতনার গভীরে এ-দুয়ের মন্থন হঠাৎ অনৈসর্গিক পরিবেশে অসাধারণ অস্বাভাবিক বাঁধভাঙা স্রোতের মতো চেতনার উপরিতলে ছুটে চলে এসেছে। এর বেশি ভাববার উপায় নেই। কিংবা, ঐটুকু ভাবনার মধ্যেই নিহিতচেতন বিস্ময়ে অপলকে যা প্রত্যক্ষ করা চলে, সে কেবল শচীশের ব্যক্তিত্বের জ্যা-বিমুক্ত তীক্ষ্ণ তীব্র উৎক্ষেপের অভিভব। চোখের দেখার মাধ্যমে অদৃশ্যকে চেতনার গভীরে আহরণ করে দেবার কলাকুশলতাই "চতুরঙ্গ"র শৈলী—একটা সীমার পরে তাকে আর বিশ্লেষণ করার উপায়ও থাকে না। দামিনী অচেতন শচীশকে বরণ করে, তার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে শ্রীবিলাসকে গ্রহণ করে জীবনে। শ্রীবিলাস তবু দামিনীর জীবনে বিকল্প নয় একেবারেই—শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে শ্রীবিলাসের পায়ের ধুলো নিয়ে জীবনের শেষ কথা বলে যায় সে, "সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।"

এ-রহস্য পরবর্তী একাধিক রবীন্দ্র-উপন্যাসেই ঘোরাফেরা করেছে নূতন চরিত্রে,—ত্রিভুজ কিংবা চতুর্ভুজ প্রেমের ছকে চেতনামন্থনকর নূতন জটিলতার ঘোরপাক! "শেষের কবিতা"য় অমিত-লাবণ্যর গল্পে তার পরিচ্ছন্নতম মাত্রা। কিন্তু তারও বাড়া রহস্য অনপনেয় গ্রন্থিতে জড়িয়ে থাকে শ্রীবিলাসের অনুভবে। জীবনের চূড়ান্ত সংকটলগ্নে তার মনে হয়, "আমি তো গৃহী হইতে পারিলাম না ; আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, তাই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল

না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে।"

—এ ভাবনার বাস্তবিক যোগাযোগ-সূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ; অথচ এ অলীক নয় কিছুতেই—এর চেয়ে মর্মান্তিক 'সত্য' অভিজ্ঞতা বস্তুনিয়ন্ত্রিত জীবনে কল্পনাতীত। এর যা-কিছু পূর্বাপরতার সূত্র, সে স্তব্ধ হয়ে আছে শ্রীবিলাসের তীক্ষ্ণ-শান্ত ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতায়—যে-দাহ, যে-অভিভূতি মথিত হয়ে হয়ে আসছে তার ব্যক্তিত্বের গভীর হতে। শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের এই পূর্ণ উন্মোচিত ব্যক্তিত্বের প্রবলতাই যে-উপন্যাসের একমাত্র উপজীব্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ সেখানে অকিঞ্চিৎকর।

অনেকটা এই কারণেই গল্পের বিন্যাস অমন আপাত-বিচ্ছিন্ন। "চতুরঙ্গ" চারটি গল্পের একত্রবদ্ধ রূপ, প্রমথ চৌধুরীর "চারইয়ারি কথা"র মতো, নাকি যথার্থই উপন্যাস, এ-নিয়েও মতান্তর আছে। অন্তত এ-কথা স্বীকার করতেই হয়, "সবুজপত্র"তে 'জ্যাঠামশায়' অধ্যায় প্রকাশের পরে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প বলেই মনে হয়েছিল ওটি। অথচ পরবর্তী অধ্যায় কটি গল্পে পূর্বাপর সূত্রে একান্ত গ্রথিত। ননীবালার অন্তিম চিঠি নিয়ে 'জ্যাঠামশায়' অধ্যায় শেষ যেখানে হল, সে-যেন ডালপালা ছড়ানো এক বড়ো গল্পের, ছোটগাল্পিক ঝাঁকুনি দিয়ে, হঠাৎ থমকে পড়া। তারই অনুসৃতিভরে শুরু 'শচীশ' অধ্যায়ের ; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুসংবাদ ঐ অধ্যায়েরই অন্তর্গত, পরবর্তী অংশ সেই দুর্ঘটনারই পরিণতি শচীশের জীবনে। 'শচীশ' অধ্যায়েরও অবসান চমকপ্রদ, যদিও সবটাই ছোটগল্পোচিত না-ও হতে পারে। আবার ঐ গুহা-ঘটনার প্রসঙ্গ ধরেই 'দামিনী' অধ্যায়ের আরম্ভ, তার সমাপ্তি অসাধারণ নাটকীয় চমৎকারিতায়—শ্রীবিলাস-দামিনীর বিবাহ-সংবাদ দিয়ে। তারই ব্যথাবহ উপসংহার 'শ্রীবিলাস' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে। কাহিনীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অন্তঃসংগতি সুসংহত ; তবু বহিরাঙ্গিক কার্যকারণ সম্পর্কের গাঁথুনি কেবলই গেছে ফস্কে। উপন্যাসের প্রথাসিদ্ধ 'ন্যারেটিভ' গঠনটিকে সে স্বীকার করে নি। করবার উপায় ছিল না—অন্তশ্চৈতন্যের সমুদ্ভাস এ-উপন্যাসকলার অন্বিষ্ট, তারই প্রতিফলনে এ-প্রচেষ্টার কুশলী সমাপন। যে জীবন-চেতনা দুশ্চর, দুরধিগম্য, তার ভাষা-বাহন তির্যক অন্তর্ভেদী ; সহজ গঠন তার অবিমূর্ত।

'চলতি' ভাষার মতো চটুল গতি সে-ভাষার প্রকাশে। তবু কাঠামো তার সাধুরীতির। চমকটা আরো প্রখর হয়, যখন দেখি, সংলাপের ভাষাও 'সাধু' এখানে ; অথচ "গোরা"তে শুরু হয়ে গিয়েছিল সাবলীল চলিত সংলাপের ভাষা। আসলে গঠনের দিক থেকে আগাগোড়া উপন্যাসই তো শ্রীবিলাসের বিবৃতি। উপন্যাসকার জীবনের ঘটনাকে হুবহু উপস্থিত করেন নি, আর-পাঁচটা উপন্যাসে যেটা সাধারণ প্রথা। অতএব, এখানে শচীশ কিংবা দামিনী, অথবা জ্যাঠামশায়, না-হয়ত লীলানন্দ, এমন কি শ্রীবিলাস নিজের কথাও যখন বলে, তখন তা প্রতিটি ব্যক্তির মুখের কথা নয়, শ্রীবিলাসের স্মৃতি, ভাবনা বিজড়িত বিবরণীর জারিত রূপ। সে ভাষা শ্রীবিলাসেরই লিপির ভাষা ; কারো কথিত ভাষার লিখিত প্রতিফলন নয়। আর উপন্যাসের গল্পকালের অবিসংবাদী ভাষা-বাহন তো 'সাধু'ই ; তাকে চলতি চরিত্রের দমকা চালে চালিয়ে দিয়েছে উপন্যাসের রচনাকালের লিখন-বাচন-রীতি। জীবনকথায় যেমন, বাক্‌ভঙ্গিমাতেও তেমনি, গল্পকাল আর রচনাকালের হরগৌরী বন্ধন জড়িয়ে আছে "চতুরঙ্গ"র সর্বাঙ্গজুড়ে।

সে-গঠনের যুক্তি এবং প্রযুক্তি-সিদ্ধ গুণাগুণ খুঁজে দেখবেন রূপকলা-সন্ধানী জিজ্ঞাসু।

আমাদের কাজ শেষ হতে পারে আপাতত এই কথা ভেবে,—উনিশ শতকীয় নবজাগরণিক বাঙালি-জীবনধর্মের বিমর্দন-পটভূমিতে উচ্ছিন্ন আত্মমস্থক বিশ শতকীয় বুদ্ধিজীবী বাঙালি চেতনার দুরন্ত অস্থিরতা ঘিরে, উপন্যাস-শিল্পের এক নূতন মাত্রা—নূতনতর প্রকরণও গড়ে তুলেছে "চতুরঙ্গ", বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।

(২)

"চতুরঙ্গ"র পিঠোপিঠি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে "ঘরে-বাইরে"। ১৩২১ মাঘ সংখ্যা "সবুজপত্র"তে "চতুরঙ্গ" রচনার সমাপ্তি ; ১৩২২-এর বৈশাখ হতে ফাল্গুন অবধি চলতে থাকে "ঘরে-বাইরে" ; ১৩২৩ সালে তার প্রথম গ্রন্থন। জীবন পটভূমির আপাত বৈষম্য থাকলেও "ঘরে-বাইরে" আসলে "চতুরঙ্গ"রই পরিশিষ্ট ; কিংবা অভিন্ন একই কবি-জীবন-ভাবনার পূর্ণ পরিণতি।

নানা দিক থেকেই "ঘরে-বাইরে"র প্রেক্ষাপট তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্র-উপন্যাসে এখানেই সর্বপ্রথম গল্পকাল বিশ শতকের চৌহদ্দিতে পূর্ণ প্রবেশ করেছে ; আর তার স্বাতন্ত্র্যও যে অভূতপূর্ব, উপন্যাসের ভেতরে-বাইরে সে ঘোষণা স্পষ্টোচ্চারিত। আগে দেখেছি, "চতুরঙ্গ"র গল্প সন-তারিখের অঙ্ক মিলিয়ে উনিশ পেরিয়ে বিশের শতকে উপচে পড়েছে ; তবু গল্পের গায়ে জ্যাঠামশায়ের কালের দাগটাই রয়েছে কায়েমি হয়ে ; জ্যাঠামশায়-উত্তর প্রজন্মের ব্যক্তিত্ব যদিও পরতর কালের। "ঘরে-বাইরে"তে, সর্বপ্রথম হলেও, যে কালের অভিধা পুনঃপুন উচ্চারিত—সে 'মডার্ন'। কালের এ পরিচয় আসলে প্রবহমান ভাব-চরিত্রের পরিমাপে। তার হিসেব পরে হবে ; আপাতত দেখি, "ঘরে-বাইরে"র গল্পকাল 'স্বদেশী'র যুগের—১৯০৫ থেকে '১১ অবধি যার পরিধি ; নিখিলেশের বয়স তখন ছিল তিরিশের ঘরে। অতএব নিখিলেশ-সন্দীপ এরা উনিশ শতকেই যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছিল ; এমন কি বিমলার বিয়েও সেই পুরোনো কালেরই ঘটনা—গল্পকালে তার বিবাহিত জীবনের ৯ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তাহলেও উপন্যাসের কোথাও উনিশ শতকীয় ভাবভাবনার হস্তাবলেপ ঘটতে পায়নি ; ঐ যাকে বলে 'মডার্নিটি'—রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন 'নতুন কাল', সর্বত্রই তার একাধিপত্য। নিখিলেশের মুখে তার চারিত্র-লক্ষণও স্পষ্ট নির্দেশিত হয়েছে—"আজকাল য়ুরোপ মানুষের সব জিনিসকেই বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই করছে ; এমনি ভাবে আলোচনা চলছে যেন মানুষ-পদার্থটা কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব কিম্বা জীবতত্ত্ব, কিম্বা মনস্তত্ত্ব, কিম্বা বড়ো জোর সমাজতত্ত্ব।" "মানুষ যে তত্ত্ব নয়, মানুষ যে সব তত্ত্বকে নিয়ে, সব তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্ছে"—এই সত্য দৃষ্টি হতে বঞ্চিত 'মডার্ন' কাল।

বস্তুত, এ-কালচেতনা বাঙালির ইতিহাসে আরো পরবর্তী সময়ের ঘটনা—গল্পকাল ছাপিয়ে গল্প-রচনাকালেরও বছর সাত-আট পরে থেকে ধীরে ধীরে সুরেখ হতে পেরেছে। রবীন্দ্র-কল্পনা তাকে আগে হতে হাত বাড়িয়ে ধরেছে রচনাকালের ভাব-পরিধিতে। "ঘরেবাইরে" নিয়ে তর্কের ঝড় উঠেছিল, দীর্ঘদিন যার আঁধি চোখ ধাঁধিয়েছে ; আজও যে দৃষ্টি স্বচ্ছ হলোই পুরো—এমন দাবি করবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজের জবাবদিহি

করতে বলেছিলেন[১০], "...যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে।...লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে-অগোচরে কাজ করছে।"

আগে বলেছি, সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার কালের নিপুণ কারুকলার রহস্য খুঁজতেই বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত। "ঘরেবাইরে"র প্রসঙ্গে অতিরিক্ত কথা, লেখককেও প্রকরণটির তাৎপর্য পৃথক্‌ভাবে স্মরণ করতে হল। বস্তুত এই পরিপ্রেক্ষিতেই, সে-কালের চাপ ও চরিত্র লেখকের মনে যে-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার ছবিটি স্পষ্ট দেখে নেবার মতো। সে-কাল নিছক 'স্বদেশী'র নয়, গল্প যে-সীমারেখায় বাঁধা। বরং, ঐ কালের অন্তর্বাহিত সম্ভাবনা—অবক্ষয়ের যে অনুভব শিল্পিমনের ভাব-পরিধিতে বিচরণ করে ফিরেছে—স্বদেশী যুগের বিনাশোত্তর সেই মনোভব কাল। আগে বলেছি, তার পূর্ণ বলয়টি স্পষ্ট চিহ্নিত হয়েছে উনিশশ' কুড়ির দশকের পরে হতে—চলছে আজও কুটিল থেকে কুটিলতর হয়ে। শিল্পিমনে উদ্ভাসিত সেই জীবনসম্ভব জীবনটির সীমায়তনের বৃত্তে এবারে পরিক্রমা করে দেখা যেতে পারে।

শুরুতেই মোটা চোখেও একটা পার্থক্য প্রতীয়মান হয়ে ওঠে, "ঘরেবাইরে"ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস যার গল্প-ভিত্তি গ্রামবাংলায়—কলকাতার বাইরে ভূমিনির্ভর জীবন-পরিবেশে ; রাজারাজড়ার মতো জমিদার-অধ্যুষিত অঞ্চলে ; কবির চেনা উত্তরবঙ্গেও হতে পারে। সন্দীপের রংপুরে যাবার আহ্বান উপন্যাসের প্রথমাবধি মুলতুবি হয়ে রয়েছে। আর তার ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্তিম পর্যায়ে গ্রামীণ সমাজের ঘাতপ্রতিঘাত চোখে পড়ে—হরিশ কুণ্ডুর প্রতিবেশী জমিদারি, পঞ্চুকে নিয়ে দুই জমিদারে দ্বন্দ্ব, স্বদেশীর মাতনে সন্দীপের দলের জমিদারি হতে জমিদারিতে উত্তাপের আলোড়ন ফিরি করে ফেরা—কিংবা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা—এই সবকিছুতে গ্রাম্য পরিবেশের ছাঁচটা ঘন হয়ে আসে।

তাহলেও, উপন্যাসের মূল সমস্যার সীমানায় সে-পরিবেশের বিন্দুমাত্র অনুপ্রবেশও ঘটতে পারে নি ; সবটুকুই সেখানে বিমলা-সন্দীপ-নিখিলেশের ত্রিভুজদ্বন্দ্বে নিরেট-প্রায়। মুখ্যত সে দ্বন্দ্ব ব্যক্তিক ; বিশেষিত তিনটি ব্যক্তিত্বের—চরিত্রের নয়—পারস্পরিক সংঘাতে গড়া। এরাও আসলে সেই নিঃসমাজ, বিচ্ছিন্নতাপীড়িত, মধ্য কিংবা উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবী নয় কেবল আর, 'ওপরতলার মানুষ' ; 'ইন্‌টেল্যাকচুয়াল' যত, তার চেয়েও বেশি 'এলিট'। সন্দীপ যদি মধ্যবিত্ত কিংবা নির্বিত্তও হয়, তার উচ্চাশা ওই 'ওপরতলা'র বিত্তলোভিতার দিকেই ঠেলেছে তাকে উদ্দাম গতিতে। বিমলা সাধারণ ঘরের মেয়ে ; তবু 'ছোটরানী'র স্ফীত মর্যাদার কুলায়-তলে বসেই পৃথিবী জয় করবার মোহাতুরতায় ভুগেছে সে। আসলে এখান থেকেই রবীন্দ্র-উপন্যাস এলিট-জীবনের অনুসন্ধানী হয়েছে আদ্যোপান্ত ; "যোগাযোগ"-এর বিপ্রদাস হতে "শেষের কবিতা"র অমিত কিংবা "চার অধ্যায়"এর অতীন পর্যন্ত সেই জীবনেরই রূপালেখ্য। সকলেই এরা বুদ্ধিজীবী না-ও হতে পারে, "যোগাযোগ"-এ বিপ্রদাস-কুমুর পাশে যেমন মধুসূদন, কিংবা "শেষের কবিতা"য় অমিত রায়ের সঙ্গী কেটি মিত্তিরের দল। তাই-বা কেন, একমাত্র বুদ্ধির কসরত নিয়ে এদের কারো

১০। দ্র. 'গ্রন্থপরিচয়', "ঘরে বাইরে" র. র. ৮. পৃ—৫২২

জীবনই কাটে না ; বিপ্রদাস অথবা অমিত রায়, কারোরই নয়। অথচ সবাই এরা 'এলিট'-সমাজের, সমাজের ওপরতলার বিচ্ছিন্ন খাঁচাটিতে বসে নিঃসামাজিকতার শূন্যতায় দম টেনে টেনে ফেরে। স্বভাব এবং মনঃপ্রকৃতির গঠনসূত্রেও নাগরিকতার—'আর্বানিটি'র চরিত্র এদের মজ্জাগত ; জীবন-ছুট জীবনের লাবণ্যহীনতায় চেতনা এদের প্রক্ষিপ্ত পরিমার্জনার কৃত্রিম প্রলেপাচ্ছন্ন। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে উপন্যাসের গাল্পিক অবস্থান যেমনই হোক, সে-কেবল বহিরঙ্গ পরিবেশের খবর ; ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্ব—তথা গল্প-চরিত্রেরও স্বাতন্ত্র্য ঐ নাগরিক প্রসাধনের প্রখরতার।

"ঘরেবাইরে"তে সেই জীবন-লক্ষণের প্রাথমিক চিত্ররূপ। নিখিলেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জীবনপ্রিয় জমিদারের সহৃদয় ছবিটি এঁকেছেন ; অনেকটা হয়ত নিজের জমিদার-জীবনের অভিজ্ঞতা আর আগ্রহের আদলে। তাহলেও, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক জায়গায় নিখিলেশের তফাত আমূল ; প্রজাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কিংবা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তার ছিল সামান্যই। সেই কারণেই, অন্যায় জেনেও নিজের জমিদারি জুড়ে সন্দীপের যথেচ্ছাচার রোধ করবার উদ্যম কিংবা সামর্থ্য কোনোটাই হয় নি তার ; যেমন বেধেছে, নিজের ঘরে রাহাজানি হচ্ছে জেনেও তার প্রতিরোধ করতে। নিজের সম্পর্কে অন্তিম আক্ষেপ করেছিল নিখিলেশ, "শক্ত কথা এই যে কারও জীবন একলার জিনিস নয় ; সৃষ্টি যে করবে সে নিজের চারদিককে নিয়ে যদি সৃষ্টি না করে তবে ব্যর্থ হবে।...নিজের সঙ্গে নিজের চারিদিককে যারা সহজেই সৃষ্টি করতে পারে তারা এক জাতের মানুষ, আমি সে জাতের না। আমি মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারি নি।" এই অপারগতা কেবল নিখিলেশের অন্তর্বদ্ধ ব্যক্তিত্বের নয়, ব্যবচ্ছিন্ন 'এলিট' মানসিকতারও এক সাধারণ লক্ষণ।

এই উন্মূলনের ছবিটি আরো স্পষ্ট সন্দীপের মধ্যে। এক কালে ভারি ঝগড়া হয়েছিল, সন্দীপ কী স্বদেশী যুগের নেতৃত্বের প্রতিনিধি? অমন নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খল—প্রায় 'ভিলেন'! নারীদেহে তার লুব্ধতা ছলচাতুরির কোনো বাঁধন মানে নি, 'বিধবা কুসুম' হতে হস্টেলের কাছের 'ফিরিঙ্গি মেয়েটি' পর্যন্ত কেউ ছাড়া পায় নি সে লালসা থেকে—শেষ গ্রাস নিয়ে খেলা চলেছে উপন্যাসে বিমলার সঙ্গে! ধনের চাহিদাটাও তার সমান উদগ্র! তারপরেও এমন প্রশ্ন কি করে উঠেছিল—আজও যার সংশয় কাঁটার খোঁচার মতো ঘুরে ফেরে,—সন্দীপ ঐ ত্যাগমহিম জীবনোচ্ছ্বাসের পুরোগামীদের একজন কি না? স্বদেশী যুগের প্রাণবন্যার প্রদীপ্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ আগ্রহ পুনঃপুন সমুচ্চারিত ; এরই মধ্যে তার নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ আমরাও করে নিয়েছি। তবু একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই তো, যে, 'স্বদেশী'র মায়াজালের ভেতর হতেই সন্দীপ তার ক্ষুৎপিপাসু নখদন্ত বিস্তার করতে পেরেছিল। সবটা মিলে রহস্যটি খুঁটিয়ে দেখবার মতো।

"গোরা"র বেলায় দেখেছি, 'স্বদেশী'র সচল প্রবহমানতার স্রোতে ভেসেছিল সেদিন ঔপন্যাসিকের আন্তর চেতনা—উপন্যাসের ব্যক্তিগত জীবন-জটিলতাও তার টানে কেমন ওতঃপ্রোত জড়িয়ে গিয়েছিল সামবায়িক জীবন-ইতিহাসের উত্থান-পতনের অবিচ্ছিন্ন ধারায়। গোরা-সুচরিতার অন্তিম মিলনের গভীরে ঐ সর্বায়ত জীবন-সাধনের প্রত্যাশা মঙ্গল-দীপের আলোর মতোই কাঁপতে থাকে। "গোরা"র গল্পকাল স্বদেশী যুগের আগেকার ; তার গল্পাবেদন শিল্পিমনে বহমান 'স্বদেশী' যুগের উদ্দীপনা-মথিত। অন্যপক্ষে "ঘরেবাইরে"র গল্প 'স্বদেশী' কালের ছকে ধরা ; কিন্তু শিল্পিমনের মৌল জিজ্ঞাসাটি

'স্বদেশী'-উত্তর সর্বাত্মক বিনষ্টির উৎস সন্ধানে উদ্বেজিত। তারই টানে, কবি আপন অভিজ্ঞতা-অনুভবের পাকে-পাকেও জড়িয়েছেন গল্পকে ; স্বদেশীর কালের এবং স্বদেশী-উত্তর কালের স্মৃতি এবং ঘটনার যোগাযোগে গড়া তার ঔপন্যাসিক কাঠামো!

রবীন্দ্রনাথ নিজে 'স্বদেশী'র প্রথম যুগে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই পশ্চাদপসরণ করে আসেন। তার জন্যে নিন্দা-কুৎসার অবিরল বর্ষণে জর্জরিতও হয়েছিলেন প্রথমাবধি। 'স্বদেশী' জাগরণের উৎসুকতম প্রত্যাশী হয়েও 'স্বদেশী' কর্মধারার সঙ্গে যোগ রাখা সম্ভব হল না—এ কেবল কবির নিজের জীবনের দুঃখকর অভিজ্ঞতা নয়, জাতীয় দুর্ভাগ্যের মূলও নিহিত আছে ঐ সব কার্যকারণের গভীরে। সেদিনের আন্দোলনের প্রধান ঝোঁকটা ছিল প্রতিরোধাত্মক ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল আত্মউজ্জীবক সাধনার। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তার বাস্তব পরিকল্পনা চূড়ান্ত ; 'আত্মশক্তি'র মতো প্রবন্ধাবলিতে সে প্রেরণাদর্শ স্পষ্টোচ্চারিত। আসলে প্রতিরোধের প্রবণতা বিধ্বংসী ; রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল সাংগঠনিক। 'স্বদেশী'র কর্মকাণ্ডে 'বয়কট'-এর ঝোঁকটাই ছিল প্রায় একমাত্র—বিদেশী পণ্য বর্জন, বিদেশী বিদ্যালয় বর্জন, বিদেশী কর্তৃপক্ষের সংসর্গ বর্জন—এমনি সবকিছু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, বিদেশী পণ্য বর্জন তখনই স্বাভাবিক এবং সহজ হতে পারে, স্বদেশী পণ্য যখন প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে অনায়াস-লভ্য ; আর স্বদেশী বিদ্যালয় না গড়ে তুলে বিদেশী বিদ্যালয় বর্জন করতে হলে দেশ যে কেবল ছেয়ে যায় অশিক্ষার অন্ধকারেই!

অন্যপক্ষে আদর্শের উদ্দীপনা গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপের সহজ পথে প্রসারিত হতে না পারলে সংঘশক্তির মাৎসর্য উত্তুঙ্গ হয়ে উঠতেই পারে ; বানের জল অবলীলায় প্রাকৃতিক খাতে বয়ে যেতে না পারলে যেমন কূল ভাঙাভাঙির মত্ততায় জড়িয়ে পড়ে। তারই ফল দেখা গিয়েছে শক্তির জবরদস্তিতে ; কর্মবঞ্চিত যৌবনের উৎপীড়ক উত্তেজনায়। এই সব ছবিই আঁকা হয়েছে উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে! আর মন-জাগানোর দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে জোর করে উদ্দেশ্য সিদ্ধির অপপ্রয়াস যে-বিরুদ্ধতাকে অনিবার্য করে তোলে, ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে তারই জাজ্বল্যমান প্রকাশ 'স্বদেশী'র মর্মে সাম্প্রদায়িকতার বিভীষিকার ছুরিকাঘাতে।

অন্যপক্ষে, দেশের জন্য গঠনশীল উদ্যমের যে-ভাবনা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনুভব এবং অভিজ্ঞতায় ছিল, তারই ছক আঁকা আছে নিখিলেশের নিঃসঙ্গ কর্মতৎপরতায়। বিদেশী পরিচালকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জাহাজ চালাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতে চলা কিংবা স্বদেশী শিল্প গড়ার নানা কৌতুককর চেষ্টার গভীরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বস্বপণ জীবনব্রতর স্মৃতিই আলোড়িত হতে থাকে।

কিন্তু মূল প্রশ্নটি আরো গোড়াকার। বিমলা-সন্দীপ-নিখিলেশের ত্রিভুজ প্রেমদ্বন্দ্বের স্বতন্ত্র স্পষ্ট একটি চরিত্র রয়েছে উপন্যাসে। নিখিলেশ তার উত্তরাধিকারলব্ধ উচ্ছৃঙ্খল জীবন-অভিজ্ঞতা আর চন্দ্রনাথবাবুর কাছে পাওয়া জীবন-প্রত্যয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রে 'সত্য' আদর্শের এক উত্তুঙ্গ ভাবলোকে আরূঢ়, প্রতিদিনের আটপৌরে জীবনাচরণের জগৎ যেখান হতে প্রায় আবছায়াঘেরা। নিখিলেশের দাম্পত্য প্রণয়াদর্শের মধ্যেও একটা সমুচ্চতা এবং সত্যতার বোধ আছে ; কিন্তু রক্তমাংসের জীবনের দাবির কাছে সে পাংশু বিবর্ণ। বিমলা প্রথমেই অনুযোগ করেছে, "আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের

দরকার অনেক বেশি ছিল।" কিন্তু নিখিলেশ তার জন্যে এত 'সেবা'র আয়োজন করেছিল যে, সবকিছুকে ঠেলে 'নিজেকে দান' করে ফেলার অবকাশই হারিয়েছিল বিমলার জীবনে। নিখিলেশও বোঝে, "পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সবচেয়ে খোঁজে আমার স্বভাবে হয়ত সেই জোর নেই।" তাছাড়াও রূপগুণের নানা টানা-পড়েনে ওদের দুজনের জীবনে জোড় মিলেও কেন মিলল না, আর তারই ফাঁকে সন্দীপ তার জবরদস্তিভরা ব্যক্তিত্বের জোরে কি করে ঝড়ের তোড়ে ঢুকে পড়ছিল ওদের দাম্পত্যের মাঝখানে, তার একটা নিখুঁত মনস্তাত্ত্বিক ছবি আঁকা যেতে পারত উপন্যাসে। আসলে আঁকা হয়েওছে তাই, যদিও, যথেষ্ট সংহত নয় তার গ্রন্থন—সব কিছু এলোমেলো অগোছালো করে দিয়েছে 'স্বদেশী' ঝড়ের দমকা হাওয়া।

আসল কথা ঐ 'স্বদেশী'র উপস্থাপনার রহস্যই। তাইতে মিলে গল্পের চরিত্রে দোটানা সঞ্চারিত হয়েছে ; ব্যক্তিগত প্রেমের চারপাশে ঐতিহাসিক ঘনঘটার অবরোধ! সব কিছু জড়িয়ে "গোরা"র মতো 'মহাকাব্যধর্মী' উপন্যাসও হতে পারল না "ঘরেবাইরে"—"চোখের বালি"র মতো মনোবিশ্লেষণমূলকও নয়।

আসলে রবীন্দ্রনাথ, আগেও বলেছি, ঐ 'স্বদেশী'র কালের রহস্যটিকেই খুঁজেছিলেন সেদিন। তাতে কটা কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল—ঐ স্বদেশি-উত্তর কালে। সেদিনের সেই জীবনযজ্ঞের তলানিতে নিভৃতে জড়িয়ে পড়েছিল উগ্র, অনপেক্ষিত ব্যক্তিত্ব-পরতন্ত্র মনঃপ্রবণতার তাড়না—ব্যবচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত মানসিকতার যা অবক্ষয়ী মৌলিক লক্ষণ। একান্ত ওই ব্যক্তিত্ব-পারতন্ত্র্য থেকেই উদ্ভব ব্যক্তিসর্বস্ব আত্মচিন্তনের—যার চূড়ান্ত অবসান অন্ধ আত্মপরতায়। ঐ শেষোক্ত ছবিটির আবছা আভাস কবি দেখেছেন "ঘরেবাইরে"র রচনা-সমসাময়িক জীবনে—আমাদের বৃহত্তর সমাজদেহে তার স্পষ্টতর প্রসার। বলেছি, সে আরো একটু পরের কালের ঘটনা, আজও অবধি যার অগ্রগতি চলেছে প্রায় অবিরল। সন্দীপের ব্যক্তিত্ব ঐ যুগলক্ষণেরই দাহকর জ্বলন্ত শিখা।

ব্যক্তিগত লোভ ও লালসায় সন্দীপ 'ভিলেন' ; তবু সে পুরো 'ভিলেন' নয়। 'স্বদেশী'র আদর্শকে সে নিছক স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবেই গ্রহণ করে নি। ওদিকেও আকর্ষণ তার একরকমে আন্তরিক। একদিকে 'স্বদেশী'র সত্যব্রত, আর একদিকে স্বার্থপ্রণোদিত চেতনার উদ্বেজনা—এই আন্তরিক স্ববিরোধের আলোড়নে অস্থির তার আমূল অস্তিত্ব। নিজের সমস্যাটাকে সন্দীপ এইভাবে বিচার করে—আসলে যেটা উপন্যাসেরও মৌল সমস্যা :—"বিমল-নিখিলকে নিয়ে আমার জীবনের এই-যে একটা অধ্যায় জমে উঠেছে এর ভিতরেও অনেকটা কথা ঢাকা পড়ছে। ঢাকা পড়ত না যদি আমার মধ্যে আইডিয়ার কোনো বালাই না থাকত। আমার আইডিয়া আমার জীবনটাকে নিয়ে আপনার মৎলবে গড়ছে, কিন্তু সেই মৎলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকি পড়ে থাকছে। সেইটের সঙ্গে আমার মৎলবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে না ; এইজন্যে তাকে চেপেচুপে ঢেকেঢুকে রাখতে চাই, নইলে সমস্তটাকে সে মাটি করে দেয়।"

'মাটি' শেষ পর্যন্ত করেইছে ; বিমলার কাছে অন্তিম সাক্ষাতে নিখিলেশের সামনেই 'সর্বনাশিনী কিন্তু'র কাছে আত্মসমর্পণ করতে সেই কথাই বলেছে সন্দীপ। ঐখানে সে মডার্ন যুগের বলি ; আত্মখণ্ডিত ব্যবচ্ছিন্ন চেতনার অস্বচ্ছ উপল-বন্ধুরতায় ঘোরপাক খাওয়া। ব্যক্তিগত লোভ-লালসার মশলা মিশিয়ে মনভোলানো আইডিয়ার চাট। —সন্দীপ নিজের

'আইডিয়া' প্রকাশ করে বলেছে :—"সর্বসাধারণের জন্য ন্যায় আর অসাধারণের জন্যে অন্যায়। সফল অন্যায়পরতা আর অকৃত্রিম নিষ্ঠুরতার জোরেই মানুষ বলো, জাত বলো এ পর্যন্ত লক্ষপতি হয়ে উঠেছে।...আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকেই প্রচার করি।"

সন্দীপের মতো সচেতন 'ভিলেন' কদাচিৎ মেলে ; তার চেতন-অবচেতন অন্তর্দ্বন্দ্ব যে-টুকুই থাক—সে একান্তভাবেই তার নিজস্ব। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার নিয়ে উন্নাসিকতা 'স্বদেশী'র কর্মযজ্ঞের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েই ছিল এক সময়ে ; 'পন্থা পরিণামের পরিমাপক, না পরিণামই পন্থার', এ-সব প্রশ্ন তো ওইকাল থেকেই বিতর্কের ঝড় তুলেছিল! অন্যপক্ষে 'স্বদেশী'র পরিণাম হিসেবে মুক্তির যে ছক কাটা হয়েছিল, তাও ছিল অস্পষ্ট। আসলে 'স্বদেশী'র ঝড়টাও তো ছিল বাঙালির ইতিহাসে 'পড়ে পাওয়া ধন', বিনামূল্যের মস্ত পুঁজি। তাকে কাজে লাগানোর ঝোঁকটা যত প্রবল ছিল, তার পন্থা-প্রকাশের ধারণা তেমন স্বচ্ছ ছিল না। বিমলার কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ—"আমাদের সেদিন মনে হয়েছিল ইতিহাসের কোনো বাহন নেই, পুষ্পক রথের মতো সে আপনি চলে আসে। অন্তত তার মাতলিকে কোনো মাশুল দিতে হয় না, তার খোরাকির জন্য কোনো ভাবনা নেই, কেবল ক্ষণে ক্ষণে তার মদের পেয়ালা ভর্তি করে দিতে হয়—আর তারপরেই হঠাৎ একেবারে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি।"

স্বদেশীর মূলগত অবচেতন এই মনঃপ্রবণতাকে আজ ঐতিহাসিক সত্যের কাছাকাছি বলে অন্তত মেনে নিতেই হয়। আর তারই ফলে প্রকরণের অস্বচ্ছতাটাও ছিল অবধারিত।—নিখিলেশের ভাবনার ছাঁচে ছবিটিকে নিজের মধ্যে ধরে দেখেছে সন্দীপ—"ভারতবর্ষে আমার জন্ম ; সাত্ত্বিকতার বিষ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে মরতে চায় না। আপনাকে বঞ্চিত করার পথে চলা যে পাগলামি একথা মুখে যতই বলি এটাকে একেবারেই উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই। এই জন্যেই আমাদের দেশে আজকাল অদ্ভুত ব্যাপার চলছে। ধর্মের ধুয়ো দেশের ধুয়ো দুটোকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি—ভগবদ্‌গীতা এবং বন্দেমাতরম্ আমাদের দুইই চাই—তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পষ্ট হতে পারছে না, তাতে একসঙ্গেই গড়ের বাদ্য আর সানাই বাজানো চলছে, এ আমরা বুঝছি নে।" 'স্বদেশী'র প্রেরণা ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরকালের জন্য অপহৃত হয়েছে। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট-এর পরে এ-নিয়ে দ্বিমত থাকার উপায় থাকে নি। আর তার কারণ, সন্দীপের ব্যক্তিচরিত্রের বিচ্যুতি বা দীনতার মধ্যেই নেই। 'মডার্ন' কালচেতনার চাপে বাঙালি মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের ঐকান্তিক ব্যক্তিত্ব-নিবদ্ধতাজনিত স্ববিরোধ তাকে বিভ্রস্ত করেছে—করছে বুঝি বা আজও। তার দায়িত্ব একলা-সন্দীপের নয়, নিখিলেশেরও সমপরিমাণে।

নিখিলেশ একদিন বলেছিল, "আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে, ভারতবর্ষই মরছে।" তবু তাদের তুলে ধরবার জন্যে তাদের কাছে অবধি পৌঁছাতে পারে না সে। যাদের জন্যে প্রাণ দিতে পারে অনায়াসে, নিখিলেশ তাদের প্রাণের সঙ্গে মিলতে পারে না—ঐখানে তার ট্রাজেডি ; 'স্বদেশী' তথা স্বদেশি-উত্তর 'মডার্ন' কালেরও। "ঘরেবাইরে" এই অনুভবেরই বার্তাবহ। চন্দ্রনাথবাবু যে-পথে পঞ্চুর বানানো মাসিকে বিদায় করতে পারেন, সে পথ এদের কারো নয়—না সন্দীপের, না নিখিলেশের—

ব্যক্তিত্বমাত্রজীবী আইডিয়া-সর্বস্ব ব্যবচ্ছিন্ন মডার্ন এলিট মানসিকতার। সন্দীপও এলিট বই কী? আগে বলেছি, সামর্থ্যে না-হোক, উগ্র প্রত্যাশায়।

সেই মনঃপ্রকৃতির 'আঁতের কথা'টি তুলে ধরতেই উপন্যাসের অভিনব কলাপ্রকরণ। কত ঢাকঢোল বাজিয়ে কতলোকের কাঁধে চড়ে এসেছিল সন্দীপ ; দেশজোড়া উত্তাল আলোড়নের কী দৃপ্ত প্রতিশ্রুতি! কিন্তু রাত না-পোহাতেই উপন্যাসের জীবনস্রোত আটকা পড়ে গেল তিনটি ব্যক্তিত্বের নিভৃত ওঠাপড়া, ঘাত-প্রতিঘাতের যোগাযোগে। 'স্বদেশী'র ঝড়ের ঠেলায় গল্পের শুরু ; সে-গল্প সমে এসে যখন থেমেছে, তখন 'স্বদেশী'র ঐতিহাসিক পরিণামের গহন হতে মাথা তুলে তাকাতে থাকে ঐ তিনটি অনন্য-স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের আত্মমন্থনের চলচ্ছবি। ওদের আত্মার অতলস্পর্শ আলোড়নের একমাত্র সাক্ষী তো ওরা নিজেই। আসলে ব্যক্তিত্বের নিরুপাধি-জটিল যন্ত্রণার অনুভাবক ব্যক্তিরই নিরবলম্ব চেতনা ছাড়া আর কেউ নয়। তাই আগাগোড়া উপন্যাসটির বিন্যাস বিমলা, সন্দীপ এবং নিখিলেশ-এর 'আত্মকথা'র মাধ্যমে ; নিজের সঙ্গে যেখানে একমাত্র নিজের ছাড়া আর কারো কথা নেই। তাতে কোনো আব্রু আবরণ থাকে নি ; কিংবা নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছে যাওয়া গেছে নিজেরই চেতনার অচেনা গভীরে—পাঁচজনের মাঝখানে থাকলে যে-দৃষ্টি, যে-অনুভব ফুটতই না কখনো।

"চতুরঙ্গ"র চেতনাবাহিত কাহিনীর বিবৃতিকার শ্রীবিলাস—"ঘরেবাইরে"তে সংশ্লিষ্ট তিনটি ব্যক্তিই কথা বলেছে। এখানে তবু লেখকেরও একটা ভূমিকা আছে,—তিনটি বিচ্ছিন্ন 'আত্মকাহিনী'র টুকরোগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে অখণ্ড গল্প গড়ে তোলার। সেই বিন্যাসে নাটকীয় দ্রুততা এবং সংহতি রয়েছে, কিন্তু ক্রমাগত সংগতি নিয়ে সংশয়ও থাকতেই পারে। একেবারে প্রারম্ভিক ছত্রগুলিতে বিমলার অপরূপ কবিতাকল্লোলিত মাতৃস্মৃতিচারণ এবং আত্মধিক্কার কখনকার ঘটনা? সন্দীপ এবং নিখিলেশের 'আত্মকথা' ঘটনাবর্তিত ব্যক্তিত্বের অব্যবহিত আত্ম-উন্মোচন। বিমলার 'আত্মকথা'ও তাই ; কেবল ঐ প্রারম্ভিক অংশটি অতীতচারণের রোমন্থনে মন্থর—দিদিশাশুড়ির কাল হতে হালের কালে উত্তরণের পথের দিশেটি।

প্রারম্ভিক ছত্রকয়টিও কিন্তু গল্পকালেরও পরিণতি-পরবর্তী অনুভবের দিশারি। গল্পের শুরুতেই আপন সতীত্ব-চেতনার অভিমানে ধিক্কারাহত হবার কথা নয় বিমলার। বরং উপন্যাসের অন্তিম পরিণামের শেষে যদি ফিরে পড়ি ঐ কটি ছত্র—তাহলেই কী পূর্ণ তাৎপর্যে তার উদ্ভাসন ঘটে না? এইখানে লেখকের বিধাতৃসুলভ ভূমিকা গল্পের সহজ প্রকাশরীতির পরিসরে অনুপ্রবেশ করেছে বিন্যাস বিধানের অছিলায়। ফলে, অপরূপ নাটকীয় চমকপ্রদতা ভরে গল্পের সূচনা ঘটলেও তার পূর্বাপর স্বাভাবিকতা কতটা বিস্রস্ত হয়েছে, সেকথাও ভেবে দেখবার মতো।

তাছাড়া "ঘরেবাইরে"র ভাষায় অতিকাব্যিকতার অনুযোগও তোলা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ-ভাষা ঔপন্যাসিকের নয় ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বের আমূল মন্থিত-চেতনার আত্মপ্রকাশের ভাষা—নিজের কাছে যে-ভাষা নিজেকে স্পষ্ট করে তোলার আগ্রহে সন্তর্পণ। বিমলার ঐ প্রারম্ভিক আত্মকথন কবিতা-সুললিত নিশ্চয়ই, কিন্তু তার শায়কবিদ্ধ চেতনার অভিপ্রায় প্রকাশের প্রয়োজনে আতিশয্য খুঁজে পাওয়া কি সহজ!

"ঘরেবাইরে"র জীবন-কথায় যেমন, প্রকাশরীতিতেও তেমনি, অন্তশ্চৈতন্যের

হিল্লোলিত বিকাশই একমাত্র নয়, "চতুরঙ্গ"'র মতো ; এ কাহিনী—এ ভাষা—স্বতো-বিচ্ছিন্ন 'এলিট' ব্যক্তিত্বের আত্মসন্ধানের, আত্মসংগ্রামেরও, এক অভূতপূর্ব অনতি নমনীয় প্রমাণপত্র।

(৩)

"যোগাযোগ" "ঘরেবাইরে"'র এক 'যুগ' পরের রচনা ; আশ্বিন ১৩৩৪ থেকে ১৩৩৫-এর চৈত্র অবধি প্রকাশিত হয়েছিল "বিচিত্রা" পত্রিকায়, গ্রন্থনকাল ১৩৩৬। "চতুরঙ্গ"-"ঘরেবাইরে"'র পরে আবার প্রথাসিদ্ধ প্রকরণে গড়া উপন্যাস—ঔপন্যাসিক যেখানে বিবৃতিকার এবং যুগপৎ গল্পের বিধাতাও। তবু "চোখের বালি"-"গোরা"'র সগোত্র নয় "যোগাযোগ" একেবারেই ; তার দেহেমনে শিল্পিভাবনা-মথিত হালের কালের ছাপ আরো গাঢ় হয়ে বসেছে—গল্পকালের নিরিখে যার হিসেব এলোমেলো হতে চায়।

খ্রিস্টাব্দের গণনায় "যোগাযোগ" রচনার কাল ১৯২৭-২৯ ; বাংলাদেশের বিত্তজগতে যুগসন্ধির সহজ বৈপরীত্যের টানাপড়েন তখন ভেতরে-বাইরে উত্তাল! শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, কিংবা এমন কি আপেক্ষিক উচ্চবিত্ত জীবনের বহুলাংশেও, ক্ষয়, হতাশা এবং অবদমনের চাপ জীবনের প্রায় সাধারণ লক্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সাহিত্য তখন "কল্লোল"-অনুষঙ্গী জীবনের অভিঘাতে উতরোল।

ক্ষীয়মাণতার বৈষয়িক ঝোঁক একটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সূচিত হয়ে গিয়েছিল, এমন কি, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। তখন হতেই ব্রিটিশ সান্নিধ্যের প্রথম পর্যায়কালের যৎকিঞ্চিৎ বাণিজ্যিক প্রচেষ্টাও উধাও হয়েছে শহুরে বাঙালির মধ্যে। প্রধানত আইনজীবী, ডাক্তার, শিক্ষক কিংবা রাজসেবকের ভূমিকাই ততদিনে হয়েছিল তাদের উপজীবিকার প্রধান আশ্রয়। গ্রামীণ জমিদারি ব্যবস্থার প্রচলিত আভিজাতিক চরিত্রটিও বিপর্যস্ত হতে শুরু করেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাল (১৭৯৩) হতেই। গ্রামীণ জীবনের সামবায়িক ধারাতেও তার প্রতিফলন একেবারে নিচের স্তর অবধি বিনষ্টির চাপটিকে অবারিত করে দিয়েছিল। "যোগাযোগ"-এর গল্পকাল জীবন-অভিজ্ঞতার ঐ দিগন্তে বাঁধা—তার রচনাকাল পরবর্তী আরো এক দিগন্তে—ঔপন্যাসিকের ভাবনায় নিজস্ব উদ্বেজনাও ছিল প্রচ্ছন্ন।

উনিশ শ কুড়ির দশক—অর্থাৎ বিশ শতকের তৃতীয় দশকে "যোগাযোগ" রচনার কালে বাঙালি সমাজের সর্বমুখী অবক্ষয় প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছিল। শহুরে মধ্যবিত্তের জীবিকার্জনের পূর্বোক্ত অভ্যস্ত ক্ষেত্রগুলিতে আর্থিক প্রতিশ্রুতি ক্রমশই হ্রস্বতর হয়ে আসছিল ; যৌথপরিবার-প্রথার বিধ্বংসশেষে গ্রামের ভূমি-নির্ভর জীবন হতে আত্মম্ভর ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শহুরে জীবন সম্পূর্ণ উন্মূলিত। এরই মাঝে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) শেষে বাংলা দেশেও ব্যাবসায়িক সম্ভাবনা ক্রমপ্রসারিত হতে আরম্ভ করে। কারখানা-ভিত্তিক ব্যবসায়ের প্রয়োজনে কয়লাশিল্পের আকস্মিক বিস্তার এইসময়ে এক সর্বভারতীয় ঘটনা। আর খনিমালিকের ভূমিকাতে থেকে কিছু কিছু বাঙালিও শিল্পবাণিজ্যের সঙ্গে সেদিন আবার জড়িয়ে পড়েছিলেন। ঐ সময়কার গ্রামভাঙার পটভূমিতে সদ্য গড়া শ্রমিক ধাওড়ার জীবন্ত ছবি আছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো কোনো উপন্যাসে—"হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" তার মধ্যে প্রধান একটি। অন্যপক্ষে "ধাত্রীদেবতা"'র মতো উপন্যাস অথবা 'জলসাঘর'-এর মতো গল্পে সাবেক কালের জমিদারির বনেদিআনার ভঙ্গুর পশ্চাৎপটে

বণিকবৃত্ত আত্মভুক্ জীবনের সংকীর্ণ-পরিসর চরিত্রটির আভাস রয়েছে—যা প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের প্রেক্ষিত-চেতনার ফসল।

"যোগাযোগ" রচনার সময়ে ঔপন্যাসিকের মনে এই বহমান জীবন-চরিত্রের আবহাওয়া ঘুরে ফিরছিল—অনেকটা হয়ত অজান্তেই ; তার সঙ্গে ছিল সমকালীন জীবন-দেখা অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণ-তির্যক আলো,—"চতুরঙ্গ" থেকে যার সূচনা। এই চেতনা-ভাবনাকেই রূপ দিতে গল্পের আশ্রয় হল আঠারো-উনিশ শতকের জীবন-প্রচ্ছদ। গল্পকালের সঙ্গে রচনাকাল এবং তারও চেয়ে বেশি শিল্পীর মনোভব কালের জোড় মেলানো কঠিন হল ; অথচ উপন্যাসের কাঠামো বা আবেদন যে বিস্রস্ত হয়ে গেলই—এমন অনুযোগও টেকানো দায়। "যোগাযোগ"-এর প্রসঙ্গে সেই রহস্যটি খুঁজে দেখবার মতো।

মধুসূদনের ব্যক্তিত্বে অসাধারণতা ছিল যথেষ্ট ; গুণগত পার্থক্য আমূল হলেও, পরিমাণগত প্রাচুর্যে যা বিপ্রদাসের ব্যক্তি-ধর্মের কাছেও দুর্বল নয়। আপন ভাগ্য জয় করার দুর্জয় উদ্যম,—তার জন্যে কোনো ত্যাগ, কোনো নিষ্ঠা—কোনো প্রচেষ্টার অভাব ছিল না। তবু তার ব্যক্তি-চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণতা ছিল ; সর্বত আত্মভুক, একচ্ছত্র অধিকার-পিপাসু আগ্রাসিতা ছিল তার স্বভাবের প্রথম প্রবৃত্তি। আর একথা বোঝা গেছে, তার প্রধান কারণ—জীবনকে সে মাপতে চেয়েছিল বৈষয়িক সফলতার—বিত্তগত প্রাচুর্যের মানদণ্ডে। আসলে এ-সবই বণিকবৃত্ত মনঃপ্রকৃতির রুদ্ধপ্রসার আত্মম্ভরিতায় ভারাক্রান্ত। এই চারিত্রধর্ম প্রত্যক্ষভাবে বিশ শতকের,—উপন্যাস রচনার সমকালীন জীবন-অভিজ্ঞতা ও অনুভবের ভাবনিশ্বাসিত।

কিন্তু, এই জীবন-চরিত্রকে উপস্থাপিত করা হয়েছে অষ্টাদশ-উনিশ শতকের ঐতিহাসিক প্রচ্ছদে। বিপ্রদাসের পিতার জমিদারি আভিজাত্যের জৌলুস বৃদ্ধি করতে দেখা গেছে 'অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলাতি আসবাব' ; কিংবা মধুসূদনের ছোটবেলায় রজবপুরের মফস্বলি হাটে 'গাঁটবাঁধা বিলিতি র‍্যাপার'ও ছড়ানো থাকত 'গুড়ের কলসী' কিংবা 'আঁটি বাঁধা তামাকের পাতা'র পাশে। সবার ওপরে কুমুদিনী-বিভ্রান্ত মধুসূদনের ব্যবসায়ে তার দুর্বলতার প্রথম ছিদ্রপথ প্রতিপক্ষের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল পুরোনো নীলকুঠি কিনে নেবার উদ্যম উপলক্ষ করে। নিশ্চয় সেকাল ১৮৬৮-রও বেশ কিছু আগেকার, যে-বছরে নীলচাষীদের প্রতি অবিচার-প্রবল আইনের ধারা কয়টি রদ হয়ে গিয়েছিল, কিংবা তার আগে বেশ কিছু বছর ধরে এ-নিয়ে আন্দোলন যখন উত্তাল হয়েছিল।

কিন্তু সেকালের জমিদারি এবং বাণিজ্যবৃত্তি—দুয়েতেই উদারতা, এবং এমন কি, উদাত্ততারও একটা সহজ বাতাবরণ ছিল—কেবল 'মুনাফাখোরে'র দীনতা তখনো ব্যবসাদারের চেতনার আস্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে নি। আর আঠারো থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি বাঙালি সমাজে জমিদারে-ব্যবসায়ীতে পার্থক্য ছিল সামান্যই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মহর্ষি' বলে খ্যাত হয়েছিলেন ; তাঁর 'প্রিন্স' পিতা স্বভাবের কতকাংশেও কী 'রাজর্ষি' ছিলেন না ? মতি শীল, কিংবা রামদুলাল সরকারের মতো মানুষের জীবন-কথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাছাড়াও, ব্যাবসায়িক সমৃদ্ধির অনুপূরকও কতকাংশে ছিল সেদিন ভূম্যধিকার বৃদ্ধির আগ্রহ। জমিদারি উদাত্ততার চরিত্রটি ধরা আছে উপন্যাসে বিপ্রদাসের পিতার মর্যাদা-প্রখর নিঃশব্দপ্রায় অভিমানী মৃত্যুবরণে ; কিংবা বিপ্রদাস-জননীরও আত্মনাশী সুমহৎ প্রতিশোধ গ্রহণে।

বস্তুত, সেকালের জীবনযাত্রায় মহাকাব্যিক প্রচ্ছদ একটা ছিলই ; স্বভাবত যা মধ্যযুগীয়

সামন্ততান্ত্রিক দোষগুণের বিচিত্র উপাদানে গড়া। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা-লাঞ্ছিত হয়ে সে জীবন চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ গল্পটা ফেঁদেছিলেন মহাকাব্যিক প্রচ্ছদেই ; "তিনপুরুষ" নাম দিয়ে—তিনপুরুষের ওঠা-পড়ার গল্প। মধুসূদনের পিতা আনন্দ ঘোষাল যার প্রথম পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ মধুসূদনের পুত্র সদ্য বত্রিশ বছর বয়স্ক অবিনাশ ঘোষাল। আর সে গল্পের পূর্ববর্তী গল্প ছিল নুরনগরের ভূম্যধিকার নিয়ে চাটুজ্জে-ঘোষালদের সর্বিক দ্বন্দ্বের—যার পরিণামে ভিটেমাটি ছাড়া ঘোষালেরা অবশেষে রজবপুরবাসী ; চাটুজ্জেরাও হৃতমূল। সে-সব ঘটনা সপ্তদশ শতকের সীমাতেও ঠেলে উঠতে বাধা নেই। দেশেকালে ব্যাপ্ত পুরুষানুক্রমিক বিস্তারের এ-কাহিনীতে মহাকাব্য-সম্ভাবনা ছিলই একটা।

আর তার আদলটা ঔপন্যাসিকের মনে জেগেছিল পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রে। দ্বারকানাথের ব্যাবসায়িক কীর্তির স্মৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জন্মান নি, তবু সে স্মৃতিচারণার অংশীদার তিনি হতে পেরেছিলেন নিশ্চয়ই। মধুসূদনের কর্মকাণ্ডের খুঁটিনাটিতে দ্বারকানাথের কীর্তি-কলাপের ছায়াসম্পাত ঘটেইছে—মায় ঐ নীলকুঠি সংক্রান্ত যোগাযোগেও। তথ্যের হুবহু অনুকরণ না-হোক, তাথ্যিক সংস্কার অনেকটা অজ্ঞাতেও ঔপন্যাসিকের পরিবেশ-চিন্তাকে প্রভাবিত করে থাকবে। মধুসূদনের 'রাজা' উপাধির অনুষঙ্গে 'প্রিন্স'-প্রসঙ্গও মনে আসতে পারে।

তাহলেও মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব রেনেসাঁস-মূল্যচেতনার উদারতা এবং উদাত্ততা-বিবর্জিত, দ্বারকানাথ যে-ধারার এক মুখ্য প্রতিভূ ছিলেন। তার চেতনা ও সংস্কার বণিক্‌বৃত্তি-প্রবল সময়ের আগ্রাসন-লুব্ধ,—সেকথা বলেছি আগে। মধুসূদনের গাল্পিক কালের সঙ্গে তার ব্যক্তি-প্রবণতার কাল-পরিবেশগত ব্যবধান আমূল—এইখানেই উপন্যাস-ভাবনার গ্রন্থি ; উপন্যাসের গঠনেও তার ছাপ পড়েছে।

"তিনপুরুষ" নাম দিয়ে যে-গল্পের সূচনা—"বিচিত্রা"য় দু-সংখ্যা প্রকাশিত হতেই শিল্পী তার নামান্তর ঘটালেন—"যোগাযোগ"। অনেক কৈফিয়ত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—যার মোদ্দা কথাটি হল,[১১] গল্প একটু চলতেই বোঝা গেল—"বিষয়ে'র চাহিদা সে মিটিয়ে চলতে রাজি নয়। অতএব, 'কর্তা'র দেওয়া নামটাকেই সে 'বেকবুল' করতে চায়। তখন "কর্তা বলেন, তিন পুরুষের তিন-তোরণ-ওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে এই আমার একটা খেয়ালমাত্র ছিল। এই চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্যে নয়। নিছক ভ্রমণ করবার জন্যেই। সুতরাং এই নামটা ত্যাগ করলে আমার গল্পের কোনো স্বত্বের দলিল কাঁচবে না।"—কাঁচুক না-কাঁচুক গল্পের কিন্তু কথার খেলাপ হয়েছে। তাতে প্রতিশ্রুত মূল গল্পটা অনুক্ত থেকে গেছে ; এবং তা সত্ত্বেও তার অবিচল প্রারম্ভিক কথাবস্তুর অবস্থান যথাবর্ণিত গল্প-কৌতূহলের ওপরে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে থাকে।

'গল্পটা'র 'আরম্ভ' হয়েছিল অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বছরের জন্মদিনে। এক নিঃশ্বাসে ঔপন্যাসিক জানিয়েছিলেন—"আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো।" আগাগোড়া "যোগাযোগ" উপন্যাসে সেই 'সলতে পাকানো'র খবরটাই আছে আবর্তিত কুটিল সংঘট্টের টানাপড়েনে। 'সন্ধ্যাদীপ' আর মোটেই জ্বলে নি। তাতে আলো-আঁধারি আবছায়া চেপে বসেছে গল্পের গায়ে—যে-গল্প বলা হয়েছে, তারও।

---

১১. 'গ্রন্থপরিচয়',—"যোগাযোগ",—র. র. ৯, পৃ—৫৪৫-৪৬

মধুসূদন ঘোষালের পুত্র অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বছরের জন্মদিন ৭ আষাঢ় ; তাই নিয়ে কাহিনীর শুরু। মধুসূদন-পত্নী কুমুদিনীর বয়স বিয়ের সময়ে ছিল ১৯ বছর। অঘ্রানে বিয়ে হতেই তার সন্তান-সম্ভাবনা ঘটে—দশম মাসের মাথায়, তার আগে না হলে, বোঝাই যাচ্ছে, সেই সন্তানের জন্ম হয়েছিল। অতএব, অবিনাশ ঘোষালের আলোচ্য জন্মদিনে তার মা-র বয়স প্রায় ৫২ হবার কথা ; কুমু কি তখন বেঁচে ছিল, থাকলে কোথায়? কেবল অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার বাধ্যতাবশেই স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার সময়েও সন্তান জন্ম দিয়েই সে-ঘর ছেড়ে চলে আসার প্রতিশ্রুতি তার মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছিল।

অন্যপক্ষে, 'কালো কঠোর ক্ষুধিত জরাক্রান্ত' দেখেছে কুমু মধুসূদনকে বিয়ের পরে-পরেই। তার সেদিনের বেশি বয়সটা কত বেশি, বিয়ের সময়ে কত বছর হয়েছিল তার? অবিনাশের ৩২ বছরের জন্মদিনে তার 'বাপ' মধুসূদনই বা কোথায়? যে-জট পাকিয়ে গিয়েছিল কুমু-মধুসূদনের জীবনে প্রথম হতেই, তার পরিসমাপ্তি কোথায় কী ভাবে ঘটেছিল অবিনাশের বত্রিশ বছরের সীমানা অবধি?

জিজ্ঞাসা আছে—কিন্তু উত্তর নেই। উত্তর না থাকাতে গল্পের কোনো ক্ষতি হয় নি—প্রাসঙ্গিক যে-গল্প শেষ পর্যন্ত একমাত্র হয়ে উঠল উপন্যাসের আদি-অন্তে, সেখানে অবিনাশ ঘোষালসম্পর্কিত প্রথম চার পংক্তির দুটি অনুচ্ছেদ এবং প্রথম পরিচ্ছেদের অন্তিম বাক্যটি সম্পূর্ণ নিরর্থক, গল্পান্তে বিস্মৃতপ্রায়। ভুলে গেলে সমস্যা থাকে না ; জোর করে মনে করতে চাইলেই জট পাকায়।

আসলে তিনপুরুষের তিন তোরণ ঘিরে যে-গল্পের তিনমহলা বাড়িটি গড়বার কথা ছিল, ঔপন্যাসিক কথা দিয়েও তার থেকে নিরস্ত হয়েছেন। মহাকাব্যিক গল্প-সম্ভাবনা এপিগ্রামাটিক তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাবাহিতায় বিলীন হয়েছে। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতির অতিরিক্ত দায়টা গল্পের ঘাড় থেকে নামিয়ে দেওয়া কী যেত, অবিনাশ ঘোষালের প্রসঙ্গটি বেমালুম উহ্য করে দিলে! আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতি তাতে হত না কিছু ; অনায়াসে "যোগাযোগ" উপন্যাসের নাটকীয় সূচনা ঘটতে পারত তৃতীয় অনুচ্ছেদে 'এই কাহিনীর পৌরাণিক যুগ সন্ধান'-এর সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তাহলেও, গল্পের গ্রন্থিমোচন হত না—যে-গ্রন্থির উৎস শিল্পীর মনে ধরা গল্পকালের সঙ্গে রচনা-সমকালীন জীবন-সমস্যার টানাপড়েনে। সন্দেহ নেই, সেই সমস্যাও শিল্পীরই অন্তর্ভেদী সুতীক্ষ্ণাগ্র জীবনদৃষ্টির ফসল।

আলোচ্য ধরনের রবীন্দ্র-উপন্যাসের স্বাভাবিকতা তথা বাস্তবিকতা নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন তোলা হয়েছে। একটা কথা তাতে প্রায়ই শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক চরিত্রেরা সব একই ভাষায় কথা বলে—সে রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব কাব্যিক ভাষা। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক—বিভিন্ন রকমের :—

বিয়ের পরেই খটকা লেগেছিল কুমুর,—মধুসূদনের জবরদস্তির ক্রূর ভয়াবহতা দেখে। মোতির মার সঙ্গে কথোপকথনে মোতির মা-ই ইঙ্গিত করেছিল, স্ত্রীকে 'চিঠিতে দাসী বলে দস্তখত' করতে হয়। কুমু প্রশ্ন করেছিল, "স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন্ জাতের লোক?"—মোতির মা-র তাৎক্ষণিক জবাব, "...ও যে কেবল অন্যকে গোলামি করায় তা নয়, নিজের গোলামি নিজে করে। যেদিন আপিসে যেতে পারে না, নিজের বরাদ্দ থেকে সেদিনকার টাকা কাটা পড়ে।"

কথাটা মধুসূদনের প্রসঙ্গে, তার ব্যক্তি-চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য তীক্ষ্ণ তর্জনী-সংকেতে উজ্জ্বল হয়েছে এখানে। এবং তাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই এমনিতে। কিন্তু যখন ভাবি,

বক্তাটা হচ্ছে মোতির মা,—উনিশ শতকের একটি সমৃদ্ধ পরিবারের পরোপজীবী অক্লান্তকর্মা গৃহিণী নারী, যার শিক্ষা-দীক্ষার মান নিঃসংশয় নয়, অথচ তারই অনুভবে মধুসূদনের ব্যক্তিচেতনায় স্বভাব-দাসত্বের এই বিড়ম্বনাটি এমন করে ধরা পড়েছিল—এমন ভাষায় প্রকাশ পেয়েছিল, দ্বিধা তখন জাগতেও পারে মনে। এবং তাহলেও গল্প পড়তে পড়তে মোতির মা-র চরিত্রের সঙ্গে এই সংলাপকে কিন্তু অংসগত মনে হয় না। তার আগাগোড়া আচরণ, চলন-বলন সর্বত্রই এমন একটি অন্তর্লীন পরিমার্জনা রয়েছে—রুচির, অনুভবের, সূক্ষ্ম অথচ সহজ পরিশীলনের,—যে, মোতির মা তার নিজের ভূমিকায় কোথাও অসংলগ্ন হয়ে নেই। কেবল রচনাকালীন শিল্পি-মনোভাবনার প্রেক্ষিত হতে গল্প-নির্দেশিত উনিশ শতকের কালে তাকে ঠেলতে গেলেই স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত প্রশ্নটি মনে লাগে।

একই কথা নবীনের প্রসঙ্গেও ; মধুসূদনের সংসারে পরোপজীবীর ভূমিকায় তার অবস্থাটি অনেকটা শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' গল্পের রমেশের মতো। চারিত্রিক সততা ও আন্তরিকতার বশে যথার্থই সে তাই ; অথচ চারুতাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের সামর্থ্যে "শেষের কবিতা"র অমিত রায়ের গোষ্ঠিভুক্ত হতেও তার বাধা নেই। 'বউরানী' কুমুকে উপলক্ষ করে তার সংলাপটুকু মনে করা যেতে পারে—"বিধাতা তোমাদের হাতে ঠকাবার যে-সব উপায় দিয়েছেন তাতে মধু দিয়েছেন ঢেলে। সেই মধুময় ঠকানোকেই বলে মায়া।"—কুমুর কথার উত্তরে আরো বলেছিল, "মায়া গেলে সংসারে রইল কী? মূর্তি রঙ খসিয়ে ফেললে বাকি থাকে খড়মাটি। দেবী, অবোধকে ভোলাও, ঠকাও, চোখে ঘোর লাগাও, মনে আশা জাগাও, যা খুশি করো।"

আসল সমস্যাটা ঐখানে ; রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত জীবন-দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর বাস্তবিক অভিজ্ঞতার জীবনের দূরত্ব। এ-পর্যন্ত বিবেচনায় দেখা গেছে, ভূমি-নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক আভিজাতিকতার ভগ্নপ্রাকারের সমান্তরাল রেখায় উদীয়মান বণিকবৃত্ত জীবনের কাঞ্চনকৌলীন্যের হার্দিক দীনতার ছবি ; তারই পটভূমিতে বিশ শতকীয় 'আলোকপ্রাপ্ত' 'এলিট' সমাজের সর্বপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের একান্ত অন্তর্লগ্নতার তীক্ষ্ণ-তীব্র আত্মমন্থনই উপন্যাসের মুখ্য 'থীম' হয়ে ধরা দিয়েছে। কিন্তু নতুন মানুষদের নতুন জীবনযাত্রার খুব কাছে আসবার উপায় ছিল না আর ষাট-পেরোনো শিল্পীর পক্ষে। মনে তাঁর আপনকালের স্মৃতিমন্থিত ধারণার ছাঁচ—বিপ্রদাস তাই উনিশ শতকীয় 'পজিটিভিস্ট' বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্বের এক উদাত্ত প্রতিনিধি ; অথচ ভাবে-অনুভবে, বেদনায় এবং জটিলতায় তার অভিব্যক্তি বিশশতকীয় 'এলিট' জীবনের সমতুল।

একটা কথা ভাবতেই হয়। উপন্যাসের বিবরণে শিল্পী 'ধাবমান নতুন কালে'র প্রসঙ্গ টেনেছেন বারে বারে ; কিন্তু সেকালের হদিশ দেন নি স্পষ্ট করে কোথাও। অনেকটা, মনে হয়, অষ্টাদশ শতকান্তিক ভৌম সামাজিক সামন্ততন্ত্রের ভিতভাঙা উনিশ শতকীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রসঙ্গ যেন। অথচ, আসলে, বিপ্রদাসের অন্তর্নিরুদ্ধ বেদনা—কুমুর মর্মমন্থনের চরিত্র, বিশশতকীয় সর্বপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের নিঃসঙ্গতাবোধে জর্জরিত।

এ কেবল জীবনের প্যাটার্ন বদলই নয়, ব্যক্তিত্বকে ঘিরে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির তীক্ষ্ণধার অন্তর্ভেদিতার মাত্রাবদলও বটে,—প্রায় আমূল। বিয়ের লঙ্কাকাণ্ড শেষে কুমু যখন গাঁটছড়া বেঁধে বেলা চারটে নাগাদ হাওড়ায় পৌঁছে মধুসূদনের সঙ্গেই ব্রুহাম গাড়িতে গিয়ে বসে, তার সঙ্কটাপন্ন চেতনার ছবি এঁকেছেন তখন ঔপন্যাসিক, "কলকাতার দিবালোকের অসংখ্য

চক্ষু, তার সামনে কুমুর দেহমন সঙ্কুচিত হয়ে রইল। যে একটি অতিকায় শুচিতাবোধ এই উনিশ বছরের কুমারী জীবনে ওর অঙ্গে অঙ্গে গভীর করে ব্যাপ্ত, সেটা যে কর্ণের সহজ কবচের মতো, কেমন করে ও হঠাৎ ছিন্ন করে ফেলবে? এমন মন্ত্র আছে যে মন্ত্রে এই কবচ এক নিমেষে খসে যায়। কিন্তু সে-মন্ত্র এখনও বেজে ওঠে নি। পাশে যে মানুষটি বসে আছে, মনের ভিতরে সে তো আজও বাইরের লোক। আপন লোক হবার পক্ষে তার দিক থেকে কেবল বাধাই এসেছে।"

চিত্র-বিকম্পিত এই এপিগ্রামাটিক বিবৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অতলস্পর্শ মনের রহস্য তলিয়ে দেখার যে সন্তর্পণ আয়াস রয়েছে, বিনোদিনী কিংবা ললিতা-সুচরিতার ব্যক্তিত্বের উন্মোচনে এই প্রকরণটি রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তেই আসে নি তখনো। তার অর্থ এমন নয় যে, এ-দেখার ধরন বেশি সর্বায়ত কিংবা সম্পূর্ণ। কেবল পরিপার্শ্ব-পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অভ্যন্তরে অত তলিয়ে, অত খুঁটিয়ে দেখতে গেলে চারপাশের জীবন-ছুট সে হয়েই পড়ে। কিংবা উল্টো করে বলা চলে, এমন একান্ত আত্মসংবদ্ধ—এমন অমিশ্র অন্তর্নিরুদ্ধ বলেই, এমন সব ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান অত গোপন-গভীরের দিকে টানে, মন খুঁজতে মনের তলানি অবধি। ভাষা তখন হার মানে ঐ ভাবাতিশায়ী অনুভবকে ব্যক্ত করতে ; তাই কথার গায়ে লাগে রেখার টান—বাক্যের সর্বাঙ্গ ঘিরে অনির্বচনীয়ের ব্যঞ্জনা। "তিনপুরুষ" তাইতেই শিল্পীর অভিপ্রেত রূপ হারিয়ে হয়ে পড়ে "যোগাযোগ"।

বস্তুত, জীবনের তীক্ষ্ণ-একাগ্র চরিত্রটিই যদি দৃষ্টির একান্ত সাধ্য হয়, তা হলে সে-দেখার পরিধি চারপাশে বিস্তৃত হতেই পারে না। তলিয়ে যেতে চাইলে ছড়িয়ে পড়তে বাধা ঘটেই। এমন নয় যে, কুমুর জীবনটার কোনো কার্যকারণগত যোগাযোগ ছিল না তার অব্যবহিত বেড়ে ওঠার জগতের সঙ্গে। তার মা-বাবার জীবন এবং তাঁদের জীবনান্ত, পারিবারিক আভিজাত্যের বিনষ্টির চাপ এবং ঐ একই পরিবার-সূত্রে পাওয়া নারী-সংস্কার, সব হারাবার মুখে দাদা বিপ্রদাসের মতো শালপ্রাংশু আশ্রয়কে একান্ত আঁকড়ে ধরা,—সব কিছু মিলে কুমুর অত জটিল, অত অন্তর্মগ্ন জীবনেরও বহিরঙ্গ ভিত একটা আছেই। তবু শিল্পী বলেন, 'কুমু স্বভাবতই মনের মধ্যে একলা'। কেবল কুমু নয়, বিপ্রদাস—এমনকি মধুসূদনও তাই নয় কী! কুমুর মতো অমন 'জন্ম-একলা' না হোক, কার্যকারণসূত্রে এরা সবাই নিজের মধ্যে নিজে নিজে বদ্ধ হয়ে পড়েছেই।

বিপ্রদাস আদর্শ জমিদার—অন্তত বংশানুক্রমিক জমিদারি ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য তার আন্তরিক। তাহলেও জমিদারির গ্রামীণ বাতাবরণেও বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে তার যোগাযোগের কোনো পরিচয় নেই। সেই অভাবটুকু ঢাকতেও বুঝিবা উপন্যাসের পক্ষ হতে তাকে শহর কলকাতাবাসী করতে হয়,—যে কলকাতায় আভিজাত্য তখনো ছিল পর্দাপাল্কিবাহিত। মধুসূদনও, অন্তত কর্মব্যপদেশে, একটা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠবদ্ধ নিশ্চয়ই ছিল। তবু তার ব্যক্তিত্বে, তার জীবনচরিত্রে, সে-সবের কোনো ছাপ নেই। আসলে সর্বপরিচ্ছিন্নতা যে-কাল হতে অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত চেতনার অনিবার্য নিয়তি হয়েছে, সেই কালের আলোহাওয়ার আনুগত্যেই গড়া "যোগাযোগ"-এর জীবনের চরিত্র। অথচ, জীবনগুলো সব উঠে এসেছে ইতিহাসের পুরালোক হতে। তাতে শোষিত-রক্ত পাংশু বাস্তবিকতার গায়ে রোমান্সের শিহরণ লাগে, ইতিহাসের সত্তায় যে-রোমান্সের অক্ষয় ভাণ্ডার সদা-সঞ্জীবিত। পাথুরে তথ্যে গাঁথা তার কঠিন ভিত, তবু দূর হতে ভেসে আসা অস্ফুট গানের কলিটির মতো রোমাঞ্চ ঘেরা তার চারপাশে। ঠিক এই কারণেই বিপ্রদাসকে

কখনোই খুব কাছের মানুষটি মনে হয় না—এমন কি, কুমুর বেদনার সঙ্গে একাত্ম হতে গিয়েও দূরত্ব এড়ানো কঠিন হয়। নবীন-মোতির মা-র কাহিনীকেও অতিপরিচিত সাধারণ জীবনের চৌহদ্দিতে ধরে ওঠা কী যায়—যদিও তারা অসাধারণ নয় কোনো অর্থেই! অথচ সব মিলিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বের অন্তর্মন্থনের চাপ তাদের পারিপার্শ্বিকতার সংগতি-অসংগতির বিতর্ককে অতিক্রম করেই যায়।

সব কিছু মিলিয়ে "যোগাযোগ"-এ তাই দেখি এক অস্ফুট এপিক কল্পনার 'লিরিক' অবসান। গল্পের 'থীম'-এর জগতের সঙ্গে গল্প-চরিত্রের আচরণের জগতের জোড় মেলাতে গিয়ে যেখানে বাধে ; অথচ সেই গরমিলের হিসেব নিকেশের প্রশ্নই ওঠে না কখনো পৃথক ভাবে সচেতন ভাবনার দরবারে। ঐটুকুই "যোগাযোগ"-এর শিল্প-চারুতার স্বাতন্ত্র্য। কেবল মধুসূদনকে নিয়ে খটকা যেন ঘুচতে চায় না। দ্বারকানাথের কালের কর্মপ্রয়াসীর ব্যক্তিত্বে প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের চারিত্র যোজনা করতে চাওয়ার অনচ্ছতা যেন ঘুচল না কিছুতেই। তার অধিকার-বোধের অন্ধতা আর তার অন্তর্দ্বন্দ্বের পীড়া—এ দুয়ের সংঘাতে তার প্রকাশ সাবলীল হয়ে উঠতে পারল না শেষ পর্যন্ত। শ্যামাসুন্দরী-সংঘটনকেও স্বীকার করে নেওয়া যদি যায় প্রথম প্রতিক্রিয়ার উন্মত্ত অভিক্ষেপ হিসেবে, তবু কুমুর অনুপস্থিতি তার চেতনার তলায় তলায় যে শূন্যতার সৃষ্টি করছিল, প্রকাশ্যে কুমুর ছবি শয্যাগৃহে সংস্থাপনে যে আন্তরিক গোত্রান্তরণের সূচনা, শ্যামার নির্বাসনে যার স্পষ্টতর উদ্ভাস, তার স্বচ্ছ পরিস্ফুরণ দেখা গেল কই চূড়ান্ত মুহূর্তে কুমুকে ঘরে-ফেরানোর উদ্যমে?

এমন নয় যে, নম্র হয়ে কুমুকে বরণ করতেই হবে ; কিন্তু মধুসূদনের সাবেকি 'প্রভুত্ব' এবং নানা ভাঙ্গচুর শেষে তার ক্ষুধিত 'স্বামিত্বে'র দোটানাও ফোটে নি কোথাও। কেবল ঐ পরিণামেই নয়, মধুসূদনের গোটা ব্যক্তিত্বে ইতিহাসের কাল আর রচনাসমসাময়িক কালের অভিভব কেমন যেন ভীমদলিত কীচকদেহের মতো পিণ্ডাকার হয়ে আছে—অবয়ব-রেখায়িত হতে পায় নি।

আসলে বিপ্রদাস-মধুসূদন উপলক্ষ, রবীন্দ্রনাথের লক্ষ ছিল কুমুর নারী-ব্যক্তিত্বের উন্মোচন। বাঙালির রেনেসাঁস-ভাবনাশ্রিত সাহিত্য-কল্পনার সাধারণ প্রবণতা ব্যক্তি-নারীর জীবন-মহিমাঙ্কনের আগ্রহে। কিন্তু এ এক স্বতন্ত্র ঘটনা। জীবনের অন্তিম গল্পগুলির একটি, 'বদনাম', সম্পর্কে রানী চন্দকে বলেছিলেন কবি[১২], "প্রথমে আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীর পত্র গল্পে বলি। তারপরে আমি যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধা পেলুম, ছাড়ব কেন, সদুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।"—এ বলাটা নারীর অস্তিত্বের সংকট নিয়ে পুরুষ-প্রধান সমাজের বিরুদ্ধে অনুযোগ অনেকটা। কিন্তু আসল সংকট বাইরের সমাজ-সংস্থানে যত, তার চেয়ে বেশি চেতনার অভ্যন্তরে—প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় নিক্ষিপ্ত কিংবা অভ্যস্ত নারীপুরুষের অস্তিত্বের মূলগত। ব্যক্তিসত্তার মর্মন্তুদ অন্তর্মন্থনের রহস্যটিকে তলিয়ে দেখবার আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ 'মেয়েদের পক্ষে' নয় কেবল, মেয়েদের মনের কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে চেয়েছেন এই সময়ে বিশেষ করে। তারই প্রথম স্বচ্ছ অভিব্যক্তি কুমুর জীবন-চিন্তনে—যার অস্ফুট পূর্বরূপ বিমলা কিংবা দামিনী-কথায়! মেয়েদের মন খুলে দেখার নিত্য নূতন প্রয়াস চলেছে তারপরে "শেষের কবিতা",

---

১২. রানী চন্দ—"আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ" (১৭ মে ১৯৪১-এর কথা) পৃ. ১০৩-১০৪

"দুইবোন", "মালঞ্চ" এবং, এমন কি, "চার অধ্যায়"-এও।

আরো একটা কথা মনে করবার মতো। বিজ্ঞানসিদ্ধ মনোবিকলনের উপলক্ষ ধরে নারীপুরুষের দেহ-মন্থনের এক নূতন প্রবণতা সেদিন বাংলা সাহিত্যের একটা অংশে একাগ্র হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাতে বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কথা যথেষ্ট গ্রাহ্য হয় নি। সেই কালপরিবেশে পুরুষের জীবন-কেন্দ্রে নারীকে নিবদ্ধ করে জীবনের সহজ চিত্রটিকে খুঁজতে চেয়েছেন কবি এবার আপন কথা-রচনায়।

মোতির মা একদিন কুমুকে বলেছিল, "ভালো না বাসলেও ভালো স্ত্রী হওয়া যায়, নইলে সংসার চলবে কী করে?" মধুসূদন ভেবেছিল, "কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটি মাত্র রাস্তা আছে, সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা।" সে রাস্তা যখন খুলে গেছে, তখনো কুমুর তীক্ষ্ণ অনুভব, "এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।" আবার তার আগেই তার কী সে ব্যাকুল আর্তি—"কী আছে আমার, কী দিতে পারি যাতে মানুষের ছেলের কান্না কমে!"

ওই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর মেলে নি উপন্যাসে, মেলবার নয়!—কারণ নানামুখী চাহিদার টানাপড়েনে ব্যক্তির জীবন যেখানে ছিন্ন-পরিচ্ছিন্ন, সেই সংকটাক্রান্ত জীবনের 'আঁতের কথা' নিয়েই তো কুমুর,—"যোগাযোগ" উপন্যাসের গল্প।

(৪)

জন্মসূত্রে "যোগাযোগ" আর "শেষের কবিতা"র নৈকট্য নিবিড়। ১৩৩৪ বাংলা সালের আশ্বিন হতে ১৩৩৫-এর চৈত্র অবধি "যোগাযোগ" "বিচিত্রা"তে প্রকাশিত হয়ে চলেছিল ; প্রায় ১১ মাস পরে, ১৩৩৫-এর ভাদ্র মাসে, শুরু হয়ে একই সঙ্গে "শেষের কবিতা"র প্রকাশ "প্রবাসী"তে চলেছিল ঐ চৈত্র পর্যন্তই। দুটি উপন্যাসেরই গ্রন্থন কাল ১৩৩৬। অর্থাৎ দুটি উপন্যাসের রচনা আর প্রথম প্রকাশের কাল অদূরবর্তী ছিল। তাহলেও, প্রথম দেখায় মনে হতেই পারে, শিল্পগুণের স্বাতন্ত্র্যে এদের ব্যবধান দুস্তর ; প্রথমটি যদি উপন্যাস হয়ও, দ্বিতীয়টি হয়ত উপন্যাসের ছদ্মবেশে কবিতা! নামকরণেও সেই সংকেতই রয়েছে কী? তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, রচনাদুটির মধ্যে গোত্রের চেয়ে মাত্রার তফাতই বেশি ; "শেষের কবিতা" উপন্যাসকলার দাবিকে কদাপি এড়িয়ে চলে নি।

বস্তুত "শেষের কবিতা"ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস যার গল্পকাল আর রচনাকাল—তথা কবি-ভাবনাধৃত কাল-চরিত্রে ব্যবধান অল্পই চোখে পড়ে। গল্পের পরিণতি বিশ শতকের কুড়ির দশকেরই ; আর "শেষের কবিতা" রচনার খ্রিস্টসালটি হল ১৯২৮। অমিত 'যোগমায়া'কে সকৌতুক অনুযোগ করেছিল, 'বিংশ শতাব্দীর মাসিমারা বিয়ে দিতেও ভয় পান' বলে ; সে নিজে শিলং গিয়েছিল 'সুনীতি চাটুজ্যের বাংলাভাষার শব্দতত্ত্ব' সঙ্গে নিয়ে—অবসর বিনোদনের সঙ্গী হিসেবে। বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কিত সেই মহাগ্রন্থের প্রকাশ ঘটেছিল ১৯২৬-এ। অতএব অমিত-এর শিলং যাত্রা তার পরবর্তী কালের ঘটনা।

গল্প-নির্দেশিত পূর্বকালের সঙ্গে জোড় মেলাতে এখানেও হিসেবের টানাপড়েন একটু ঘটেই, তবু মিলছুট হয় না একেবারে। যোগমায়ার স্বামী বরদাশঙ্কর ২৭ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছিলেন ; গল্পের উত্তর পর্বে তাঁর ছেলে যতিশঙ্কর কলেজের পড়ুয়া, মেয়ে

পড়তে পারত বিদ্যালয়ে। বরদাশঙ্করের পিতামহ জ্ঞানদাশঙ্কর 'বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের' ঝড়ো হাওয়ায় প্রগতির পালে ভর করেছিলেন। সে-যদি উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে না হয়ে চতুর্থ দশকেও হয়[১৩]—তাহলেও, বরদাশঙ্করের জন্ম সময় ঐ শতকের অষ্টম দশকের দ্বিতীয়ার্ধ অবধি টেনে নামানো খুবই অসম্ভব হয় না। অন্যপক্ষে অমিত-এর শিলং পাহাড় বাসের সময় যদি 'সুনীতি চাটুজ্যের' বই-এর নিরিখে ১৯২৬-২৭ হয়, আর যতিশঙ্করের বয়স তখন কুড়ির ঘরে পৌঁছে থাকে, তাহলে বরদাশঙ্করের মৃত্যুর সময় বিশ শতকের প্রথম দশকেই এসে পৌঁছোয়। যোগমায়া তখন সদ্য কুড়ি বছর পেরোবার কথা, গল্পের শিলং পর্বে তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

কালের হিসেব পাওয়া গেল ; এখন দেশ তথা পরিবেশ, আর পাত্রের প্রসঙ্গ। তর্কের ঝোঁকে অমিত বলেছিল, "ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে ; খুদে খুদে অ্যারিস্টক্রাটে পৃথিবী ছেয়ে গেল—কেউ পলিটিক্‌সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে।" ঝাঁঝালো সে তর্কের সবটুকুই সমান গ্রাহ্য নাও হতে পারে ; কিন্তু "শেষের কবিতা" আসলে বাংলাদেশের ওই 'অ্যারিস্টক্রাট' সমাজেরই জীবন-কথা—সমকালের প্রচলিত পরিভাষায় 'দক্ষিণপাড়ার ইঙ্গবঙ্গ সমাজ'-এর। অমিত নিজে অতি অবশ্যই 'এলিট', কিন্তু কেটি-সিসি-লিসি কিংবা তাদের দলবল একেবারেই তা নয়। কেটির ঠোঁটের মতো, জীবনছুট ওদের জীবন চড়া রঙে এনামেল করা। বাঙালি 'আর্বানিটি'র এই জীবন-বিচ্ছিন্ন সাধারণ চেহারা "চতুরঙ্গ" থেকেই অবয়বান্বিত হতে দেখেছি ক্রমশ। এবারে একটা সুচিহ্নিত দেশকাল-বলয়িত জীবনের আধারে সেই সমস্যারই এক বিশেষ দৃক্-কোণাগত চরিত্রটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

তার এক পিঠে আছে অমিত-এর কলকাতা-সহচর সমাজ, তাদের নিঃসমাজ বিচ্ছিন্নতা মর্মসঙ্কুচিত কৃত্রিমতায় তাদের আচ্ছন্ন করছে। অমিত তাদের দলে বাস করেও সে-দলের নয়। আরেক পিঠে আছেন যোগমায়া তাঁর ধ্রুপদী ব্যক্তিত্ব নিয়ে—ঔপন্যাসিকের ভাবানুমত উনিশ শতকীয় জীবন-ঐতিহ্যের সুনিশ্চিত দিশারি। আর আছেন লাবণ্যর বাবা অবনীশ দত্ত, লাবণ্য আর শোভনলাল। 'আর্বান' জীবন-চরিত্রের অনুর্বর বন্ধ্যাত্ব থেকে এরা মুক্ত, বাস্তব জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাব পরিপূরিত হয়েছে তাদের বিদ্যা-পরিমার্জিত অন্তর্জিজ্ঞাসু প্রবণতায়। আসলে যে জগতে আমাদের বাস, তার আধিভৌম পরিমণ্ডলই মানবিক অস্তিত্বের একমাত্র ধারক নয়। মানুষের সমাজ মানুষের মূল্যবোধেই জীবন্ত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঘাতপ্রতিঘাতে আন্তরিক মূল্যচেতনা আপন বিশেষ গড়নটি খুঁজে পায়। অথচ, প্রত্যক্ষ জীবনের বদলে মূল্যচেতনার রসদ যদি অন্তর হতেই কেবল নিঃসারিত হয়—যার সমৃদ্ধি বিদ্যার ব্যাপক-গভীর পরিমার্জনায়, তারও একটা চরিত্র আছে। বস্তুভূয়িষ্ঠ নয় সে—কিন্তু তাই বলে অবাস্তবও বলবার উপায় নেই তাকে কিছুতেই। বাস্তব চেতনার গতি বাইরের অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে অন্তরের অভিমুখে ; এই নতুন আত্মপরতন্ত্র চেতনার সবটাই অন্তর্ভেদী—তাই তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ণ, দুরূহ।

লাবণ্যকে ঐ কথাই বলেছিলেন যোগমায়া, "অনেক পড়ে অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে ; তোমরা ভিতরে ভিতরে যে-সব ভাব গড়ে তুলছ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ

১৩। ১৮১৭ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার বছর।

যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাওনা। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ করে দেহটাকে যেন অগোচর করে দিচ্ছে। আমাদের আমলে মনের মোটা ভাবগুলো নিয়ে সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিল, সমস্যা কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলেছ যে কিছুই সহজ রাখলে না।"

আপন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এমন অনপনেয় সমস্যায় জর্জরিত হওয়াই আধুনিক মানুষের নিয়তি। তারই ট্রাজেডি "যোগাযোগ"-এ কুমু আর বিপ্রদাসের জীবনে। মধুসূদনের বাস্তব-অবলিপ্ত স্থূল চরিত্রও তার অভিঘাত বাঁচিয়ে চলতে পারে নি। তার উল্টো পিঠে "শেষের কবিতা"কে কি বল্‌ব 'কমেডি'—না 'ট্রাজি-কমেডি'! সমস্যার গ্রন্থিজাল এই নূতন অনুসন্ধানে আরো অনেক সূক্ষ্ম—আরো অননুভবনীয়, অনির্বচনীয়।

অমিত এই জীবন-ধারায় এক অদ্ভুত আবিষ্কার। 'আর্বানিটি'র আড়ষ্ট কৃত্রিমতা হতে 'এলিট' অস্তিত্বের মর্মভেদী আত্মজিজ্ঞাসুতার মধ্যেকার সচল সংযোগ-সেতু যেন—'আর্বান অ্যারিস্টক্রাসি'র সঙ্গে 'রিঅ্যাল অ্যারিস্টক্রাসি'র ; —যে অ্যারিস্টক্রাসি ছড়ানো যোগমায়া থেকে লাবণ্য-শোভনলাল অবধি। অমিত-এর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আন্তরিক সাধর্ম্যও ওদের সঙ্গেই, যদিও সে স্বভাবত দলছুট।

"শেষের কবিতা"র আসল জিজ্ঞাসা নারীপুরুষের পরস্পর-বিলম্বী অস্তিত্বের রহস্য-সন্ধানী। "যোগাযোগ"-এর জিজ্ঞাসারই আরেক রকমফের। সমাজহীন ব্যক্তির জীবনেও প্রেমই অনিবার্য গ্রন্থি। বিপত্নীক অধ্যাপক অবনীশ একদিন ভেবেছিলেন, প্রাণের বাড়া একমাত্র কন্যা বিয়ে না করে বিদ্যার সঙ্গেই গাঁট ছড়া বাঁধবে। আরেকদিন প্রৌঢ় বয়সে বইয়ের পাতা তাঁকেও আর বাঁধতে পারে না, রহস্যময়ী বিধবা প্রৌঢ়া প্রেয়সীর ভাবনায় "মডার্ন রিভিয়ু"র লোভনীয় আলোচনার দাবি উপেক্ষিত হয়ে পড়ে থাকে। পিতার এই দুর্দশা শোভনলাল-প্রহত লাবণ্যর মনকে বুঝি আরো কঠিন করেছিল ; তবু 'মিতা'র টানে 'বন্যা'র বাঁধ তো ভাঙল! আর তখন লেখকের সেই কথাটি মনে আসেই, "যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত তাকে ভালোবাসবার অবসর যদি কোন একটা বাধায় ঠেকে ফসকে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উল্টো পিঠে।" অমিত-এর দুর্বার পৌরুষের ধাক্কায় লাবণ্য-র মধ্যে 'বন্যা' যখন জাগল, আর যখন কেটি মিত্তিরের এনামেল করা গাল বেয়ে কেতকীর অন্তর্বিগলিত অশ্রুধারা দুই অসম প্রেম-বন্ধনে বাধা হয়ে দেখা দেয়, তখনই রুদ্ধ পুরাতন প্রেম পুনর্জন্ম লাভ করে আপাত-বিদ্বেষের নির্মোক ভেঙে। কেবল কেটি মিত্তির আর কেতকীর অন্তঃসংঘাতে কেতকীত্বে তার পরিণামী উত্তরণ স্পষ্ট হতে পায়নি—না অমিত-বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, না অমিত-বিলগ্ন জীবনে। এপিগ্রামাটিক শিল্পবাণী 'ইঙ্গিতে আর ভঙ্গিতে'ই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যায় নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কেটি চরিত্রে তার বিকাশ ও পরিণামের সংকেতও অনুভবনীয় নয়—এ নালিশ থাকতেই পারে।

"শেষের কবিতা"য় প্রেমের বি-সম দ্বিমাত্রিক পরিণতির প্রসঙ্গে অনেক তত্ত্বালোচনা হয়েছে—প্লেটোনিক প্রেম বনাম পার্থিব প্রেম ইত্যাদি। সে-সব কথা 'কবিতা'র প্রসঙ্গে কতটা মূল্যবান্‌, জানা নেই—কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে নিশ্চয়ই অবান্তর। বুঝতে হবে, এ-উপন্যাসে ব্যক্তির ব্যক্তিগত অস্তিত্ব, তথা নিজের কাছে তার মূল্য-তাৎপর্যের সমস্যাই চূড়ান্ত ;—এ-যেন টিকে থাকা-না-থাকার সমস্যাই। আর বৃহত্তর সম্পর্কের সকল পথ যেখানে রুদ্ধ—আপন বিদ্যা, বুদ্ধি, ভাবকল্পনার মন্থনে উদ্ভাবিত প্রেমানুভবের বিষামৃতই

সেখানে জীবনের—অস্তিত্বের—একমাত্র আলম্বন। অধ্যাপক অবনীশের বেলা তার চরম মূল্য আপনা থেকে পরিস্ফুট হয়েছে।

কিন্তু "যোগাযোগ"-এ কুমুর মর্মমন্থনের ভার "শেষের কবিতা"র গায়ে লাগে নি ; সবটুকুই যেন 'হীরার ধার'। সে কেবল অমিত-এর ক্ষুরধার বুদ্ধিপ্রসূতই নয়, কথায়-কবিতায় মিলিয়ে জীবনের গতি উপল-তরঙ্গিত এক ঝর্নাস্রোতের মতো বিচিত্র সমস্যার খানাখন্দ টপকে লাফিয়ে এগিয়ে গেছে। আগে বলেছি, এধরনের উপন্যাসের সমস্যা "চোখের বালি" বা "গোরা"র মতো বিশ্লেষণ-বিকলন সাপেক্ষ নয়, বরং বিদ্যুৎচমকের মতো সংকেত-সমুদ্ভাসিত। "চতুরঙ্গ"তে সেই 'এপিগ্রামাটিক' প্রকরণ সবচেয়ে প্রখর হলেও জীবন-সমস্যার বাস্তবিক চাপটা তার মূল হতে উধাও হয় নি ; "শেষের কবিতা"য় যা হয়েছে বলে মনে হয়। তার একটা কারণ, অনুমান করা যেতে পারে, অমিত-এর চরিত্রই শচীশ-শ্রীবিলাসের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। লাবণ্য বুঝেছিল, "অমিতের মনের গড়নটাই সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে উচ্ছ্বাস তোলে।" কিন্তু জীবন-সমস্যানুভবের একটা সাহিত্যিক মাত্রাও তো আছে, নিছক বিদ্যানুরাগী জীবনের মাত্রা থেকে যা পৃথক। যেমন পৃথক্ বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রবুদ্ধ জীবন-বোধ হতে বিদ্যানুরাগী মনের জীবনানুভব। প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্রের 'নববিধান' গল্পের 'দর্শনের অধ্যাপক' শৈলেশ্বর ঘোষালের সঙ্গে অবনীশের সমস্যার তুলনা মনে আসতে পারে। বিপত্নীক দুটি মানুষের পুনরায় দারসংগ্রহের মূলগত আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের চারিত্রিক তফাত কত আমূল—একজনের মন বাস্তব জগতের বাসিন্দা, আরেক জনের মুখ্যত বিদ্যাজগতের। সেই তফাতটাই নূতন মাত্রা নিয়ে এসেছে সাহিত্যজগতের বাসিন্দা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আচরণের প্রভাবে। তার সবটুকুই 'মুখে উচ্ছ্বাস তুলে' শেষ হয়ে যাবার নয়, বরং প্রতিটি অভিজ্ঞতাই সাহিত্যিক চৈতন্যের দ্বারা পরিস্রুত হয়ে বাস্তবিক মাত্রা থেকে অনেক নির্ভার পরিমণ্ডলে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

এ-পরিকল্পনা কিছু কাল্পনিক নয়। গল্পের মূল কাঠামোটি সমকালীন সাহিত্যিক আন্দোলনের চালচিত্রে বাঁধা—রবিঠাকুর এবং রবিঠাকুরোত্তরদের ভাবদ্বন্দ্বে। নিবারণ চক্রবর্তীর কবি-প্রাণই তো অমিত-এর অমন জীবন্ত জীবনের উৎস! মাঝে মাঝে মনে হয়, বাংলা সাহিত্যে "কল্লোল"-এর অন্তত একজন শিল্পী হতে পেরেছিলেন মহাদৈশিক সাহিত্যজগতের বাসিন্দা, তাঁর নিজের দেশকালগত আধিভৌম পটভূমির তত নয়। সে এক সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রসঙ্গ, এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালেরও। "শেষের কবিতা" সম্পর্কে সেকালের তরুণ 'অক্‌সোনিয়ন' 'অপূর্ব চন্দ'-র নামও উচ্চারিত হয়ে থাকে ; অমিত-এর ঝক্‌ঝকে বাক্যতরঙ্গের কথা ভেবেই হয়ত। কিন্তু মাটির কাঠামোর ওপরে ঔপন্যাসিক রং-তুলির কাজ অনেক করেছেন নিপুণহাতে—সেইখানেই তার চারিত্রিক বিভা। অপূর্ব চন্দ ইংরেজি সাহিত্যের বিদগ্ধ ছাত্র ছিলেন ; অমিত তো এক দেহে অক্‌সোনিয়ান এবং নিবারণ চক্রবর্তী। তাই নিয়ে তার পরিপূর্ণ সত্তা। একটা কথাই কেবল স্মরণীয়,—ঔপন্যাসিকের চিহ্নিত দেশকালে ওরকম জীবন অসাধারণ হলেও অসম্ভাব্য ছিল না ; আর ঐখানেই প্রমথনাথ বিশীর পূর্বোদ্ধৃত অনুযোগের তাৎপর্য।

তীক্ষ্ণ অন্তর্মগ্ন—প্রায় অপ্রকাশ্য অনুভবের গ্রন্থি মোচনের প্রয়োজনেই সাধারণ ভাবে "চতুরঙ্গ" ও তদুত্তর উপন্যাসের ভাষা অর্থ-নির্দেশের চেয়ে অন্তর স্পর্শ করার তির্যক কলাকৌশলটি গ্রহণ করেছিল। বক্তব্যের দাবিতেই বাক্‌কলার এই চরিত্র-বদল। আর "শেষের কবিতা"-তে বক্তব্য জীবনবাণী আরো পরিস্রুত—আরো 'সাবলিমেটেড্' বলেই

তার বলার ধরন আরো ব্যঞ্জনা-ফেনপুঞ্জিত হয়ে উঠেছে। বিশী মশায়ের নালিশ ভাষার বিরুদ্ধে তত নয়, যত ভাষার ঘাড়ে কবি যে দুর্বহ দায় চাপিয়েছিলেন, তাই নিয়ে। এই বাক্প্রকরণই উপন্যাসের সমস্যাকে কবিতার দরবারে পৌঁছে দিয়েছে ; প্রথমটির নির্ভর অভিজ্ঞতা-সমুদ্ভব জীবন-উপকরণ, দ্বিতীয়টির অবলম্বন সেই জীবন-নির্যাস। "শেষের কবিতা"র কলাশৈলীর ঐটেই মূল কথা।

বুদ্ধদেব বসুর অনুযোগের কথাও স্মরণ করে বলা চলে, "শেষের কবিতা"য় ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্র ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ কবির জগতে অনুপ্রবেশ করেন নি ; উপন্যাসের জগৎ আর কবিতার জগতকে জড়িয়ে-মিশিয়ে দিয়েছেন। আসলে, রবীন্দ্রনাথের মতো অনন্যতুল্য অন্তর্ভেদী কবি-জীবন-দৃষ্টির সংযোগ না ঘটলে "চতুরঙ্গ" এবং তদুত্তর দুরূহ মর্মবিদ্ধ যন্ত্রণার ইতিহাস-চিত্র এমন ভাবে লেখা হতেই পারত না। "শেষের কবিতা"য় সেই সমন্বিত কলাশৈলীর স্বচ্ছ প্রকাশ।

(৫)

"দুই বোন" আর "মালঞ্চ" কোনোটিই পুরোপুরি উপন্যাস নয়—অনেকটাই বড় জাতের গল্প ; ইংরেজিতে হয়ত 'নভেলেট' বলা যেতে পারত। আর নভেল এবং নভেলেট-এর তফাত কেবল মাপের নয়, মাত্রারও। উপন্যাসের জীবন-জটিলতার তুলনায় বহরই কেবল কম নয়, গঠনের স্রস্ততাও তাতে ঘটতেই পারে।

দুটি গল্পই অল্পবিস্তর একই ছাঁচের, অল্পদিনের ব্যবধানে লেখা হয়েছিল "বিচিত্রা" পত্রিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে। "দুইবোন"-এর ধারাবাহিক প্রকাশকাল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ হতে ফাল্গুন ; "মালঞ্চ"র ১৩৪০-এর আশ্বিন হতে অগ্রহায়ণ। "দুইবোন"প্রথম গ্রন্থিতও হয়েছিল ১৩৩৯-এই, "মালঞ্চ" ১৩৪০-এ।

ত্রিমুখী প্রণয়ের চিত্র ;—বিবাহিতা পত্নীর রোগাক্রান্ত অপারগতার উপলক্ষে দ্বিতীয়তর নারীর টানে পুরুষ-চরিত্রের আকর্ষণ-উদ্বেজনের টানাপড়েন নিয়েই দুটি গল্প, যদিও পরিণাম-সম্ভাবনায় স্বাতন্ত্র্যের সংকেত অস্বচ্ছ নয়। দুটি রচনাই গল্প-চরিত্রের ; উপন্যাসের স্বভাব তাদের বাইরে-ভেতরে চেপে বসতে পায় নি তত।

আদিম উৎস-সূত্রে সমাজ-নিবদ্ধ তীক্ষ্ণ-স্বতন্ত্র ব্যক্তির জীবন-জটিলতার বস্তুধৃত আলেখ্যই উপন্যাস। উত্তরপর্বের রবীন্দ্র-উপন্যাসে সাধারণভাবে সমাজ-বাস্তবিকতার পরিস্রুতি ঘটেছে—কিন্তু বিলোপ ঘটে নি। অমিত রায়ের মতো এমন প্রখর-স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্র-উপন্যাসেও অলভ্য। তবু অমিত-এরও একটা জীবন-ভিত্তি রয়েছে—'আর্বান অ্যারিস্টক্রেসি'র সূত্রে যার বিকাশ। কিংবা শিলং-জোড়া নাগরিক সমাজের অস্তিত্বমাত্রই উপেক্ষিত হয়েছে মিতা-বন্যার ঝর্না-ঝর্ঝরিত প্রণয়োচ্ছ্বাসের প্রসঙ্গে। তাহলেও যোগমায়া-লাবণ্য যে আরো এক জগতের মানুষ—যে-অভিজাত্যকে 'এলিট' বলাও যেতে পারে, তার ছাপ ঐসব সুরেখ-স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সত্তায় ছড়ানো। "দুই বোন"-"মালঞ্চ"র গল্পে সেই জীবন-পটভূমিটি অনুপস্থিত—অন্তত অনচ্ছ তো বটেই। ব্যক্তির সমস্যাটাই এ-সব ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ, এবং প্রায় একমাত্র। পাত্রপাত্রীর জীবন পরিমণ্ডলের আভাস একটা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু চরিত্রের শরীর-মনে তার রং ধরে নি। মোটামুটি এ-দুটি গল্প, সবটাই, ব্যক্তির মর্মস্থলের একান্ত কাহিনী।

"দুইবোন"-এ চরিত্র-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি—প্রত্যক্ষ-পরোক্ষত ছটি ; দেশকালের একটা আভাসও রয়েছে রাজারামবাবুর পরিচায়ন উপলক্ষে। "তাঁর জন্ম সেকালের সীমানায়, একালের শুরুতে।" এ-কোন্ সব কাল, তা স্পষ্ট নয় ; তবে উনিশ শতকের শেষ পাদের এপারে রাজারামের যৌবন-সীমা টেনে তোলার উপায় নেই ; "বাংলা ভাষায় তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ছিল মেঘনাদবধ পর্যন্ত।" উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত মার্জিতরুচি বিত্তবান নাগরিক বাঙালিত্বের একটি অভিজাত ছবি দুটি-একটি কথার আঁচড়ে নিটোল হয়েছে। সেদিক হতে শশাঙ্ক-শর্মিলা-ঊর্মিমালার উপন্যাস বিশ শতকের মুখবন্ধে উঠে আসতে পারে, না-ও পারে।

কিন্তু শশাঙ্কর আসল সমস্যাটা চিরকালীন পৌরুষের। গল্পের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আভাস দিয়েছেন। শর্মিলা ছিল মায়ের জাতের মেয়ে, তাহলে ঊর্মিমালা কী প্রিয়ার জাতের? পরেও বিশেষ জিজ্ঞাসার উত্তরে এ-নিয়ে বিশদতর ব্যাখ্যা মিলেছে তাঁর কাছে।[১৪] তাতে বুঝি, শশাঙ্ক প্রথম জীবনে 'স্ত্রীর কাছে মায়ের লালনটা' উপভোগ করে অভ্যস্ত হয়েছিল। তারপর স্বাধীন 'ব্যবসা'র সূত্রে পৌরুষে যখন আড়ষ্টতার শেকল কাটল, তখনই শর্মিলার ভূমিকা উল্টে স্বামীর জীবনে হয়ে পড়ল নিরর্থক ভারস্বরূপ। শর্মিলার অসুখের উপলক্ষে ঊর্মিকে কাছে পেয়ে শশাঙ্ক আবিষ্কার করলে সে 'স্ত্রীকে চায় স্ত্রীরূপেই,...চায় যুগলের অনুসঙ্গ।' তাতেই তার ভেতরকার 'পুরুষ পৌরুষের যথার্থ অবকাশ পায়।'

ব্যক্তিসত্তার অবচেতনার অন্তরালে গুহায়িত জটিলতা জমে উঠেছে গল্পে ধীরে ধীরে ; কিন্তু সে তার ভেতরকার জোরে নয় তত, যত ঔপন্যাসিকের আপন হাতের জট পাকানোয়। এই দুটি গল্পেরই উপস্থাপনে বিধাতার ভূমিকা নিয়েছেন লেখক। তাছাড়া, সকল রকমের গল্প-উপন্যাসেরই বিধান তো তাঁরই হাতের রচনা। তবু ভেতরকার কার্যকারণসূত্রেই যেখানে গল্পের গতি সহজে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই সে গল্পকে মনে হয় স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত। "দুইবোন" এবং এর গল্পকথাকে বাইরের ঘটনার ধাক্কায় এগোতে হয়েছে থেকে থেকে। ঐখানে তার ঔপন্যাসিক গঠনের পূর্বাপরতাগত শৈথিল্য। "শেষের কবিতা"য় দুটি মোটর গাড়িতে সংঘর্ষ ঘটেছিল আচমকা—সে বিধাতার বিধান ; শিল্পী নিজেই সে বিধাতা! কিন্তু তারপরে নিজের ভেতরকার জোরের ধাক্কায় গল্প-কথা ছুটে চলেছে দুরন্ত মোটর গাড়ির চেয়ে দ্রুত চালে। "দুইবোন"-এর বেলা সেকথা বলবার উপায় নেই। বিশেষ সমাপ্তিটি গড়ে তোলবার জন্যে শর্মিলা হঠাৎ সুস্থ হয়ে ওঠে সন্ন্যাসিদত্ত তিব্বতি ভেষজের দাক্ষিণ্যে—চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা সেখানে হতভম্ব! এ-ঘটনা অসম্ভব, এমন কথা বলবার নয় ; কিন্তু এমনটিও ঘটতে পারার প্রস্তুতি গল্পের ভেতরেই ছিল না। ভাবতেই হয়, শিল্পী তাঁর ভাবনার রূপ গড়তে 'আপন মনের মাধুরী' জড়িয়ে তিলে তিলে গড়েছেন গল্পরূপ ; গল্পের ভেতর হতে গড়ে ওঠে নি জীবনের বিকচ মূর্তি।

"মালঞ্চ"র চেহারা অনেকটা রোম্যান্টিক 'কথিকা'র মতো। একসময়ে "লিপিকা"র কবিতা-মোহমদির গল্পাভ গদ্য রচনার নাম দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'কথিকা'।[১৫] আর সরলার হঠাৎ-পরিবর্তনের কথা বোঝাতে নীরজা রমেনকে বলেছিল, "ওর এখনকার

১৪। দ্র. 'গ্রন্থপরিচয়'—"দুইবোন", র. র. ১১, পৃ. ৫১২-১৫

১৫। দ্র. "চিঠিপত্র" ৫ : পত্র সংখ্যা ৮০, পৃ. ২৬১ (প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠি)।

চেহারা হৃদয়ের কোনো একটা রহস্য ঘন হয়ে ভরে উঠেছে—যেন মেঘ ছিল সাদা তার ভিতর থেকে শ্রাবণের জল আজ ঝরি ঝরি করছে—একেই তোমরা রোম্যান্টিক বল, না ঠাকুরপো!”

এই ‘রোম্যান্টিকতা’ই ছড়ানো আছে “মালঞ্চ”র দেহমনপ্রাণে। উপন্যাসের পরিভাষায় সমস্যাটিকে স্পষ্ট করে বলা চলে,—আদিত্য-সরলা প্রথম যেদিন মিলেছিল, ‘পঞ্চশরের বেদনামাধুরী’ দিয়ে অবচেতনার গহনে গ্রন্থি বন্ধন হয়ে গিয়েছিল তখনই ; কিন্তু সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সরলা বলেছিল, জ্যাঠামশায়ের বাগান ঘিরে আদিত্য আর সে বেড়ে উঠেছিল ভাই-বোনের মতো নয়, দুটি ভায়ের মতো। তারপরে নানা ছাড়া-ভাঙার শেষে নীরজাকে আদিত্য আহরণ করেছিল ভালোবাসার পরম মূল্য পণ করেই—জীবনভোর তার স্বাক্ষর রচনা করেছে দুইজনে নতুন জীবন-মালঞ্চ গড়ে গড়ে। তারপরে এল নীরজার শয্যাসাধিকা ব্যাধি ; সরলার পুনরাবির্ভাব—আর আদিত্য-সরলার আত্ম-আবিষ্কার নীরজার অদূরবর্তী অন্তর্ধান-সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে।

এ গল্পের বিকাশ আর পরিণতি “দুইবোন”-এর চেয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক ;—অর্থাৎ চরিত্রের অন্তর্নিহিত আলোড়নের টানে তার প্রায় প্রতিটি উৎক্ষেপের উৎসার। আর মুখ্য চরিত্র মাত্র তিনটি। যথাকাল শেষে আদিত্য-সরলার অবচেতনামন্থিত প্রণয়ানুভবের পুনরাবিষ্কার, পঙ্গু-অশক্ত নীরজার অন্তর্দাহ—তার ভেতরে ঈর্ষা এবং উদারতার স্ববিরোধী ঝঞ্ঝা—সব কিছুর গভীরে রয়েছে মনস্তত্ত্ব-সমর্থিত সম্ভাবনীয়তার স্বীকৃতি। আদিত্য-র নীরজা-প্রেমের সততা এবং সরলাকর্ষণের অমোঘতা, আধুনিক মানুষের অমেয়—অনতিক্রমনীয় অন্তর্বিক্ষেপেরই স্বাক্ষরবহ। গল্পের কালও রচনাকালের কাছাকাছি এসে পড়েছে মনে হয়—“মালঞ্চ”র প্রথম প্রকাশের সময় ১৯৩৩ খ্রিস্ট-সাল ; আর শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় রমেন-সরলার কারাবরণ করতে যাওয়ার ছবি ত্রিশের দশকের ‘আইন অমান্য’র ইতিহাসকেই স্মরণীয় করে তোলে। তাছাড়া, ব্যক্তি-চরিত্র কটিও হতে পারত রচনা-সমকালীন কবিমনোলোকের প্রতিবেশী।

কিন্তু গল্পের গায়ে তার ছাপ নেই কোথাও। সে অবশ্য নেই “দুইবোন”-এও। এই কারণেই বলেছিলাম—এ-দুটি গল্পের পরিপার্শ্বে দেশ-কাল-জীবনগত প্রেক্ষিতটি অনচ্ছ। “মালঞ্চ”তে আরো একটু বিশেষ ; তার একটি নূতন ধরনের সুনির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত গড়ে উঠেছে মালঞ্চকে ঘিরে—যেখানে ফুলের ভাষা, ফুলের রহস্য—ফুলের রূপগন্ধের মতোই জীবনের মস্থক যন্ত্রণাকে কবিতারস-নির্যাসে মদির করে তোলে। “শেষের কবিতা”র ভাষা কবিতাসমুচ্ছল হয়েও উপন্যাসের জটিলতা-বিভাসিত। “মালঞ্চ”তে উপন্যাস-সম্ভব জীবনসমস্যা কথায়, বিন্যাসে, চরিত্রের উন্মোচনে, কবিতা-সৌরভে মোদিত। আগাগোড়া বাস্তবতা-লাঞ্ছিত একটি গল্পের এই অভিব্যক্তিকেই বলতে হয় রোম্যান্টিক—নীরজা যেমন হঠাৎ আবিষ্কার করেছিল সরলার অন্তর্জীবন-দর্পণচ্ছায়ায়!

মনে হয়, নারীপুরুষের প্রেম-জটিলতার ব্যক্তিক চরিত্র-রহস্য যে-ভাবনায় দুলিয়েছিল কবি-মনকে “শেষের কবিতা”য়, তারই কথা-কবিতারস-বিজড়িত প্রকাশই বুঝি ঘটেছে এই দুটি লেখায়।

(৬)

“চার অধ্যায়” রবীন্দ্রনাথের লেখা শেষ উপন্যাস, কিংবা বলা ভালো, উপন্যাসের বকলমায়

কবিতাকণা-বিচ্ছুরিত 'রোম্যান্টিক' গল্পই,—"দুইবোন" এবং "মালঞ্চ"র মতো। কিন্তু তফাত রয়েছে একটি, এবং তা মৌলিক! একান্ত ব্যক্তি-চরিত্রনিবিদ্ধ জীবন-যন্ত্রণার পরিবেশন ঘটেছে এই রচনায় উত্তাল ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের ডালায়। আর তাই নিয়ে বিতর্কের ঝড়ও দুর্বার হয়েছিল ; ব্যক্তির সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্রটি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়েছে বলেই।

'কৈফিয়ত' দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন,[১৬] সেদিনের 'তর্ক ও আলোচনা'র 'অধিকাংশই সাহিত্য বিচারে'র বাইরে পড়েছিল। মূল গল্প-কাঠামোটি বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব-ইতিহাসের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে ; যেমন আরেকটি বহুবিতর্কিত রবীন্দ্র-উপন্যাস "ঘরেবাইরে"র কাঠামো গড়া হয়েছিল 'স্বদেশী' আন্দোলনের প্রেক্ষাধারে। সেবারকার মতো এবারেও ঝগড়া হল, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, তথা তার নির্মাতাদের যে-চরিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, তা কী যথার্থ—না কবির একপেশে কল্পনা-কলুষিত! এ-ঝগড়ায় একটা শক্ত হাতল রবীন্দ্রনাথই জুগিয়ে দিয়েছিলেন প্রথম সংস্করণের 'আভাস'-এ ; ব্রহ্মবান্ধব-প্রসঙ্গের অবতারণা করে।[১৭] তাহলেও কবির এ-কৈফিয়তও অভ্রান্ত যে,[১৮] 'এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা'ই "চার অধ্যায়"-এর 'একমাত্র আখ্যানবস্তু'। ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে ভালোবাসার রূপ-চরিত্রের বদল হয়, আর ব্যক্তির মৌল স্বভাবও তো তার পরিপার্শ্বের দ্বারা প্রভাবিত! ভালোবাসার স্বরূপ-চিত্রণে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তার জীবন-প্রেক্ষিতের স্বাকীয়তাটুকুকেও খতিয়ে দেখতে হয়। এ-সবকথা আনুপূর্বিক বোঝাবার চেষ্টা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,[১৯] "এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মূর্তিমান করতে চেয়েছি। তাদের স্বভাবের মূলধনটাও দেখাতে হয়েছে, সেই সঙ্গেই দেখাতে হয়েছে যে-অবস্থার সঙ্গে তাদের শেষ পর্যন্ত কারবার করতে হল তারও বিবরণ।" বলা বাহুল্য, সেই 'অবস্থা'টিই গল্পের সন্ত্রাসবাদী পরিবেশ!

অতএব, রবীন্দ্রনাথের যুক্তি হল, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বাস্তবিক গুণাগুণ নিয়ে লেখক বা লেখার কোনো দায় নেই। এলা-অতীন সেই আন্দোলনের যতটা যে-ভাবে পেয়েছে, এবং নিয়েছে—তাই নিয়ে গল্পদেহে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা। তাহলেও প্রশ্নটা ওখানে থেমে যায় নি—আজও পর্যন্ত পুরো নয়। আসলে, জীবন নিয়ে সাহিত্যের দায় এমনি করে চুকিয়ে দেওয়া কঠিন!

অতীন-এলা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত যে ভালোবাসার যন্ত্রণাবিদ্ধ যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিলে, সে-ও তো জীবন-সম্ভব! আর একেবারে শুরুতেই বলেছি, জীবনের বস্তু-বিদ্ধ নিরেট চরিত্র মানুষের চেতনার স্পর্শেই সুচিহ্নিত রূপরেখায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। সাহিত্যে সেই জীবন্ত জীবনকেই তো আমরা খুঁজি! তার ইতিহাসটি দ্বিমাত্রিক ;—এক, দেশকালপাত্রের অভিঘাতে উৎক্ষিপ্ত বস্তু-সংঘর্ষের ধারায় যার ক্রমবিকাশ ; আর এক, সেই চেতনার উন্মোচনের ইতিহাস, পারিপার্শ্বিক বাস্তবিক ঘটনাধারার সঙ্গে যোগ-বিয়োগের সংঘর্ষেই যার সচেতনতার উৎস। তাছাড়া সৃষ্টির মধ্যে জীবনের যে-ছবি, যে-রস পাই, সে তো স্রষ্টার

১৬। দ্র. 'গ্রন্থপরিচয়'—"চার অধ্যায়"। র. র. ১৩, পৃ. ৫৪৩

১৭। দ্রষ্টব্য—তদেব, পৃ. ৫৪১-৫৪৩

১৮। দ্র.—তদেব, পৃ. ৫৪৩

১৯। দ্র—তদেব, পৃ. ৫৪৩-৫৪৪

চেতনার রঙেই রঙিন। গল্পের পাত্রে এলা-অতীন যে-জীবনটাকে পেল—সে পড়ে-পাওয়া নয় কিছুতেই ; স্রষ্টার অনুভাবনার নির্যাসখচিত। অতএব, এ প্রশ্নটি থেকেই যায়,—সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব আন্দোলনের বস্তুধৃত ইতিহাস "চার অধ্যায়"-এর শিল্পীর চেতনায় কেমন করে রূপবদ্ধ হয়েছিল!—সে-রূপ মূর্ত-অমূর্ত যেমনই হোক—তারই গভীর হতে রচনার পাত্রপাত্রী কোন্ বর্ণে-গন্ধে কুড়িয়ে পেল সেই সব রহস্য!

ইতিহাস-সন্ধানের এইটিই জৈবনিক মাত্রা ; সেকথা আগেও বলেছি। তবু পুনরুক্তি করতে হয়, হবে হয়ত আরো এক-আধটু, কারণ অনর্থক তর্কের আঁধি যথার্থ-দর্শনের দৃষ্টিটিকে ধাঁধিয়ে রাখে।

একথা মানতেই হবে, রবীন্দ্রনাথের নিয়ত জীবন-সন্নিবিষ্ট মন "চার অধ্যায়" রচনার কালে স্বত-ই ঐ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবান্দোলনের ধাক্কায় বিচলিত হয়েছিল। তা না হলে, সেই জাজ্বল্যমান প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও অন্য যে-কোনো প্রেক্ষিতে গড়া চলত অন্তু-এলার ঐ 'রোম্যান্টিক' গল্প—যেমন লেখা হয়েছিল আগের দুটি। বস্তুত প্রেমের গল্প হিসেবে এদের ভেতরে চারিত্রিক পার্থক্য সামান্যই। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে "চার অধ্যায়"-এর প্রথম খসড়াটি লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল, প্রথম গ্রন্থিত প্রকাশ ঐ বছরের অন্তিম সপ্তাহে।[২০] আর "চার অধ্যায়"ই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র উপন্যাস যেটি কোনো সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় নি। হয়ত তার ভেতরকার জ্বলজ্যান্ত রাজনৈতিক সংকট-সম্ভাবনার কথা ভেবেই এ লেখাটি কোথাও প্রকাশ করতে দেন নি কবি—কিংবা প্রকাশ করতে তেমন আগ্রহ জাগে নি অপর পক্ষেও। মোটের ওপরে এমন কথা ভাবাই যেতে পারে যে, "চার অধ্যায়" রচনার পেছনে সাময়িক পত্রে প্রকাশের কোনো প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ তাড়া ছিল না কবির মনে—এ-রচনার সবটুকু প্রেরণাই তাঁর নিভৃত অন্তর-সম্ভূত।

আর তার কারণও ছিল। রাজনীতির কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে একবারই জড়াতে গিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিমুখী ধাক্কায় ফিরে এসেছিলেন কবি। তাহলেও, অর্থ-সমাজনীতিগত বিচিত্র সমস্যার মতোই রাজনৈতিক আলোড়নের প্রভাব বারে বারেই তাঁর মনকে টেনেছে ওমুখে ; কারণ সেদিনের গোটা দেশের জীবনটাই তো ভেসেছিল রাজনীতির দুর্বার স্রোতে। আর সমকালীন জীবন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ঝুঁকি ছিল তুলনাহীন। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে "চার অধ্যায়" রচনা এইসব কার্যকারণ-সূত্রেই অনিবার্য হয়েছিল।

সন্ত্রাসবাদের ঐতিহাসিক পূর্বসূত্র খোঁজা চলে উনিশ শতকের বিভিন্ন 'আখড়া' এবং গুপ্তসমিতির মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর কৈশোরস্মৃতি হতে 'সঞ্জীবনী সভা' নামক 'গুপ্তসমিতি'র সরস বিবরণ দিয়েছেন।[২১] পরবর্তী কালের রক্তক্ষরা জীবনযজ্ঞের অনেক করণকৌশল ঐসব আয়াস হতেই অজান্তে উদ্ভূত হয়েছিল। সে-যেমনই হোক, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব-ভাবনা ও প্রয়াসের জন্ম স্বদেশী আন্দোলন-এরও আগে ; 'অনুশীলন সমিতি'র ইতিহাস আজ সুপরিজ্ঞাত। তারপরে, প্রকাশ্য প্রতিরোধাত্মক গণ-আন্দোলনের সমান্তরাল ধারায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে প্রবাহিত হয়েছে অবিরল। উনিশশ ত্রিশের দশকে তার অভ্যুত্থান জাতীয় জীবনে এক চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ; এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবেও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন আপন চেতনার গভীরে।

২০। দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্রজীবনী" ৩, পৃ. ৫০৯

২১। দ্র. "জীবনস্মৃতি"—র. র. ১৭, পৃ. ৩৪৯-৫০

১৯৩০-এর এপ্রিলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন,—ঐ বছর ডিসেম্বরে বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দুই দিক্‌স্তম্ভ। তারপরে, দেশজুড়ে—বাংলা এবং বাংলাদেশের বাইরে—বিধ্বংসী প্রক্রিয়ার বান ডাকল যেন ; সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে সরকারি নির্যাতনও মানবিক কল্পনার মাত্রা ছাড়িয়ে চলল। ব্যক্তিগত অনুভবে রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে অব্যবহিতভাবে জড়িয়ে পড়েন ১৯৩১-এই। তাঁর নিজস্ব প্রত্যয় স্বতন্ত্র হলেও, রবীন্দ্র-রচনা—তাঁর গান ও কবিতা, "গীতা", "আনন্দমঠ", বিবেকানন্দ-বাণীর মতোই সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রাণের রসদ জুগিয়েছিল অফুরন্ত পরিমাণে। তারই অপ্রত্যাশিত স্বীকৃতি কবির কাছে পৌঁছালো ১৯৩১-এরই জুন মাসে ; বক্‌সা দুর্গে বন্দী বিপ্লবীরা রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করে তার অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছিলেন। তারই নিভৃত স্পর্শে কবিতা লিখে উৎসর্গ করলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে।[২২] ঐ বছরেই সেপ্টেম্বরে হিজলি বন্দীনিবাসে রাজবন্দীদের ওপরে বর্বর গুলিবর্ষণ করে নির্বিচারে হতাহত করা হয়। তার প্রতিবাদ-সভায় অপটু দেহ নিয়েও কবি উপস্থিত হন তাঁর ঐতিহাসিক তিরস্কারবাণীসহ ; পরবর্তী কালেও নির্যাতকদের প্রতি অনুকম্পার প্রসঙ্গ উঠতেই ক্ষিপ্রগতি হয়ে ওঠে তাঁর লেখনী।

এইভাবে যা ছিল চলমান ইতিহাসের উত্তপ্ততম ঘটনা, তাই কবির অনুভবে বয়ে আনল ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততার স্পর্শ। তারপরে একটানা চলেছে পীড়ন ও সরকার পক্ষের নির্যাতন—অপর পক্ষে অনমনীয় তারুণ্যের আত্ম-পরনাশী দুর্বার অভিঘাত-অভিযান ! সেই টানাপড়েনে কবির মন টেনেছে।—"চার অধ্যায়"-রবীন্দ্রনাথের সেই আমূল উদ্বেজনার ফসল।

বিপ্লবীদের দুঃসাধ্য সাধনের মূলগত সংবেদন ছিল স্ববিরোধী—যে-কোনো আধুনিক সমস্যার যা মৌল চরিত্র। একদিকে ত্যাগ, দুঃসাহস এবং আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা যৌবনশক্তির! হাসিমুখে নির্বিচারে ওরা প্রাণ দেয়—মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে নিরুদ্বেগ পরিতৃপ্তি ভরে জেলের ভেতরেও স্ফীতদেহ হয়ে ওঠে—সুযোগ থাকলে শোকার্ত-শংকিত আপনজনদের অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক ভাষায় সান্ত্বনা দেয়। অপরপক্ষে হত্যা-লুণ্ঠন-বিনাশে এরা নির্মম—যেন হৃদয়হীন। এদের না ভালোবেসে উপায় নেই, তবু এদের স্বীকার করাও তো অসম্ভব! কবি-মনের এই দ্বিমুখী প্রবণতা দ্বিধাহীন প্রকাশ কামনা করেছে "চার অধ্যায়"-এ ; একদিকে এলার অনুকম্পা :—"যখন দেশের কথা ভাবি তখন সেই সব সোনার টুকরো ছেলেদের কথাই ভাবি ; আমার দেশ তারাই। তারা ভুল যদি করে, খুব বড়ো করেই ভুল করে। আমার বুক ফেটে যায় যখন ভাবি আপন ঘরে এরা জায়গা পেল না। আমি ওদেরই মা, ওদেরই বোন, ওদেরই মেয়ে—এই কথা মনে করে বুক ভরে ওঠে আমার।" তার গায়ে গাঢ়তর শ্রদ্ধার আবরণটি আঁট হয়ে বসে যখন ইন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি শুনি, "আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারিদিকে এসে জুটল।" এই শ্রদ্ধা-বেদনাতুর অনুভবের বুকের মাঝেই আঙুল দিয়ে অতীন দেখায় তার ভয়াবহ চেহারা :—"সেদিন আমাদের দল অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুঠ করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ীর গ্রাম সম্পর্কে চেনা লোক—খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সে-ই এনেছে দলকে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বিধবা তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, মনু, বাবা তুই এমন কাজ করতে

২২। দ্র. 'বক্‌সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি'—"পরিশেষ", র. র. ১৫, পৃ. ১৯৪

পারলি? তারপরে বুড়ীকে আর বাঁচতে দিলে না।"

যথার্থ ট্রাজেডির ছকটিও অতীনের কণ্ঠস্বরে আঁকা—মহৎ জীবনের মহত্তম বিনষ্টি দিয়ে যা গড়া :—"একে একে এমন সব ছেলে কাছে দেখলুম, বয়সে যারা ছোট না হলে যাদের পায়ের ধুলো নিতুম। তারা চোখের সামনে কী দেখেছে কী সয়েছে, কী অপমান হয়েছে তাদের, সে সব দুর্বিষহ কথা কোথাও প্রকাশ হবে না।" বিপ্লবী জীবন নিয়ে আমাদের ব্যথাতুর মহিমাবোধ এইখানে মর্মে বিকম্পিত হয়ে ওঠে ; কিন্তু তারপরেই বিমুখ জিজ্ঞাসা বিক্ষুব্ধ হয়, যখন শুনি "দিন যতই এগোতে থাকল চোখের সামনে দেখা গেল,—অসাধারণ উচ্চ মনের ছেলে তিলে তিলে মনুষ্যত্ব খোয়াতে থাকল।"

এ-বিবরণ বাস্তবিক ইতিহাসের সার্বিক পরিচয় কিনা, সে বিতর্ক নিরর্থক। যে বিশেষ দৃক্‌কোণ হতে ছবিটি অতীনের চোখে পড়েছে, তার সংগতি পরখ করে দেখাই গল্প-পাঠকের একমাত্র দায়। আর অতীনের অনুভব আসলে, কবিরই অনুভব—কেবল তার নিজের নয়, কবি রবীন্দ্রনাথেরও।

প্রচণ্ড আবেগের ভরে এলাকে অতীন বলেছিল :—"...সাহিত্যলোকে প্রবেশ করলুম, দেখলুম ইতিহাসের পথে পথে রাজ্যসাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ, দেখলুম বীরের রণসজ্জা পড়ে আছে ভেঙে, বিদীর্ণ জয়স্তম্ভের ফাটলে উঠেছে অশ্বত্থ গাছ ; বহু শতাব্দীর বহু প্রয়াস ধূলার স্তূপে স্তব্ধ। কালের সেই আবর্জনারাশির সর্বোচ্চে দেখলুম অটল বাণীর সিংহাসন। সেই সিংহাসনের পায়ের কাছে যুগ যুগান্তরের তরঙ্গ লুটিয়ে লুটিয়ে। কতদিন কল্পনা করেছি সেই সিংহাসনের সোনার স্তম্ভে অলংকার রচনা করবার ভার নিয়ে এসেছি আমিও। ...তাকে কি না ভরতি করে নিলে দলের শতরঞ্জ খেলার বোড়ের মধ্যে।"

এ-কেবল অতীনের ভেতরকার পরম-সম্ভাবনার ট্রাজেডি নয় ; আসলে ঐখানেই "চার অধ্যায়"-এর জীবন দেখার মাত্রা ; সন্ত্রাসমূলক জীবন-যাত্রারও। বাইরে যে ইতিহাস বয়ে চলেছে পুঞ্জিত ঘটনার ওঠা-পড়ায়, তার পরিণাম কালের হাতের ভগ্নস্তূপে।—এরই মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে বাণীর দেউল ; সে-কেবল কবিতা-কথা-নাটক নয়, তার গহনে রয়েছে মানুষের অগ্রগতির চিরকালের আশ্রয়, উত্তরাধিকারগৌরবের অক্ষয় ভাবপ্রেরণা। সে বাণী চিরকালের মানবধর্মের। 'হেসে উড়িয়ে দেবে, রেগে বিদ্রূপ করবে', একথা জেনেও দলের তরুণদের বলেছিল অতীন, "অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হলেও তাতে হার, পরাজয়ের আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্মে বড়ো—নইলে এতবড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন?"

কেউ কেউ তার কথা বুঝেছিল, অনেকেই নয়। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠবে, যারা প্রাণ নেয় না কেবল, প্রাণ দিতেও অকুতোভয়—তাদের বড়োত্ব ভুলব কী করে? অতীনের উত্তর—রবীন্দ্রনাথেরও হতে পারত—"মানবধর্ম একটা অখণ্ড সত্য, টুকরো করে পেতে গেলে গোটা মানুষটাকেই তাতে হারাতে হয়—পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকো। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতা লাভের চক্রান্ত ও গুপ্তচর-বৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পর্বতের তলায়।"

তাই গেছে। গোটা গল্পে কেবল বটু নয়, ইন্দ্রনাথ এলাকে বলেছিল, তার ভক্তরা জনে জনে অনেকেই তার সম্পর্কে মিথ্যা কুৎসা রটনায় বিশ্বাস করেছে নির্বিচারে। ঐটে তাদের অভ্যাস। অন্যপক্ষে উমা সুকুমারকে ভালোবাসায় দুর্বল করতে পারে ভেবে ইন্দ্রনাথ তাকে বিবাহ-দণ্ড

দিয়ে নির্বাসিত করতে চায় ; অথচ এলা অতীন্দ্রে সমর্পিতপ্রাণ, এই চূড়ান্ত স্বীকারোক্তির পরেও তাকে মুক্তি দিতে রাজি নয় ; কারণ সে জানে, এলার হাতের একটি করে টিপ তরুণ মনে আগুন জ্বালায় একের পর এক। এলাকে সে বলেছে, "ভালোবাসার গুপ্ত ভারে তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি তেমন মেয়ে নও।" আর অতীন সম্পর্কেও সে জানে, "ও বাঁধা পড়েছে নিজের সংকল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোনো কালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে প্রতি মুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।"

তাই গেছে ;—অন্তু-এলা "চার অধ্যায়"-এর অন্তিম বলি ; অন্তর হাতে এলা। এ অপঘাতও কী বরণ করবার ! কোন্ মূল্যে বা অপমূল্যে ?—এই চূড়ান্ত জীবন জিজ্ঞাসা "চার অধ্যায়"-এর,—তার স্রষ্টারও !

নিজে থেকে কোনো ঘটনাই ভালো বা মন্দ নয়—অন্তর্গর্ভ উদ্দেশ্যের মূল্যেই তার চূড়ান্ত মূল্য। সেই মূল্যবোধের জোড় মেলানোর উপযোগী ভারসমতা প্রায়ই থাকে না মানুষের জীবনে। যেমন ছিল না এলার ; উপযাচিকা হয়ে ইন্দ্রনাথের দলে যোগ দিতে যে পণ করেছিল কোনোদিন সংসারে বাঁধা পড়বে না বলে। অতীন তখনো কত দূরে, আর এলার গোটা জীবনটা তখনো বিচিত্র জটিলতা-জালে জর্জরিত। কিংবা, অসাধারণ পণ্ডিত ইন্দ্রনাথ ; দুঃসাধ্যসাধক তার প্রতিভা। কিন্তু কার্যকারণের, অথবা ভাগ্যেরও, চাপে যদি সেই অপূর্ববস্তুনির্মাণ-ক্ষমতা তার সহজ সাফল্যের পথ খুঁজে পেত, তাহলে ইন্দ্রনাথ এ-পথে কী আসতেন ? বিপরীত প্রশ্নটি হতে পারে, জোড় মিলল না বলেই ঐ জোড়-ভাঙা আগুন নিয়ে খেলায় মাতলেন না কী তিনি ?

অর্থাৎ, জোড় মেলানোর সমস্যা কেবল অন্তু-এলার নয়—ইন্দ্রনাথেরও, আসলে সবাইকারই। স্ববিরোধ আর আত্মখণ্ডনে ছাওয়া আধুনিক জীবনের আরো একটি ইতিহাস-ধৃত দীপ্ত চোরাগলি ঐ ইন্দ্রনাথের দেখানো পথ—প্রবেশের দ্বার আছে, মানবাত্মার নির্গমনের নয়। তথ্য-সন্ধানীর বিচার এবং গণনা একালেও মিলছুট হবে—ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের ধারায় সন্ত্রাস-মূলক বিপ্লবের দান কতটুকু, কিংবা কতটুকু ঐ গণজাগরণমূলক প্রকাশ্য আন্দোলনের। তা নয়ত, 'শঠে শাঠ্য-সমাচরণ'-এর রাজনৈতিক পাশা খেলায় অনেক মহাপ্রাণ বলি যেমন হয়েছে—তেমনি কতটা নির্জিত হয়েছে মানবধর্ম—মানুষের আত্মার ধন ! কিন্তু এ-কথা মানতেই হবে, ১৯৪৭-এর ১৫ অগস্ট-এর পরে ঐ যুগ-যুগব্যাপী জীবনমন্থক উত্তাল আলোড়ন ইতিহাসের ভগ্নস্তূপে আসন নিয়েছে ; পরবর্তী কালের দরবারে কোনো 'বাণী'র আশ্রয়ই রেখে যেতে পারে নি সে আমাদের জন্যে। আগের কথা ছেড়ে দিলেও বিশ শতকের প্রথম ৪৭ বছরের অসাধ্য সাধন, পরবর্তী প্রতিদিন, মাস-বছরে কত নিরর্থ হয়ে হয়ে আজ বিলুপ্ত-বিস্মৃত হয়ে পড়েছে—রিক্‌থ রেখে যেতে পায় নি উত্তরসূরীদের জন্যে এক বিন্দু ! আমাদের কালের এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে দাঁড় করিয়ে "চার অধ্যায়"-এর জীবনবাণীর ঐতিহাসিক মূল্য আবার যাচাই করবার মতো।

ওটুকু বাদ দিলে, আগেও বলেছি, অন্তু-এলার প্রেমের উপাখ্যানে "শেষের কবিতা" হতে "দুইবোন"-"মালঞ্চ"র রেশ বারে বারে এসেছে ঘুরে ফিরে।

ইন্দ্রনাথ একদিন আপন দুর্বার আয়োজনের মধ্যে ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সম্ভাবনা দেখেছিলেন, বলেছিলেন, "তার সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে।" সে মহাকাব্যের কলোচ্ছ্বাস গল্পতটপ্রান্তের সীমানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঝরে পড়েছে, যা-কিছু

প্রস্তুতি সে ঐ অন্ত-এলার উজ্জ্বলতম প্রণয়ের নিষ্ঠুরতম অবসানের করুণ মূর্ছনায়। তাতে নাটকীয়তা আছে; 'ভূমিকা,' এবং চারটি অধ্যায় জুড়ে ঘটনার বিচ্ছিন্ন বিন্যাসভরে সামগ্রিকতার রূপরেখাটি গড়ে তোলার—এবং সমাপ্তিতে—অনুচ্চারিত সংঘটনের সংকেতে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে আছে সুর ; যা কবিতারও প্রাণের ধন নয়—গানের। "শেষের কবিতা" হতে রবীন্দ্রনাথ চেনা-জীবনেরও একটা 'পোয়েটিক ডাইমেনশন' আবিষ্কারে রত হয়েছিলেন—"শেষের কবিতা"র ভাষারও অনেকটা তো কবিতায় লেখা।জীবনের অনির্বচনীয় কারুণ্যের কবিতারূপ গড়ে তুলতে পারার মাধ্যম গদ্যরূপ খুঁজেছেন কবি পরপর দুটি উপন্যাসিকায়,—"চার অধ্যায়"-এ তারই চূড়ান্ত পরিণাম!—জীবনের উচ্চারণাতীত যন্ত্রণা কথার ভাষায় যেখানে সুরের মূর্ছনা রচনা করতে চায়।

(৭)

রবীন্দ্র-উপন্যাস-বিকাশের খাতটির গা ঘেঁসে পরিপার্শ্বগত জীবন-ইতিহাসের পথটি কেমন মিলেমিশে, জটপাকিয়ে এগিয়েছে, তার প্রাথমিক ছকটিকে কেবল পরিক্রমা করে দেখা গেল। তাতে একটা কথা বোঝা গেছে,—নবজাগরণের উদ্দীপনার উৎসমুখ হতে 'আধুনিক' অবসাদ-অবক্ষয়ের দিগন্ত-সীমা পর্যন্ত ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সাদাজামা-কাপড়ের নাগরিক জীবনের ওঠাপড়ার হৃৎস্পন্দনটির প্রতি কান পেতে ছিলেন—একান্ত মনে। তারই অফুরন্ত ইতিহাস আত্মগোপন করে আছে উপন্যাসের গভীরে। তাহলেও, শিল্পী কেবল বহমান জীবনের অনুসারী বা অনুকারী নন, অনাগত জীবনের বিধাতা না-ও যদি হন, দিশারি তো বটেই! নিভৃত জীবনদ্রষ্টার ভূমিকা হতে জীবন-নির্মাতার সেই আন্তরিক প্রয়াসে অবধি ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ অতন্দ্র ছিলেন। "করুণা" হতে "গোরা" পর্যন্ত তাই রেনেসাঁসের স্বতচ্ছিন্ন গ্রাম-শহরের দুটি জীবনধারাকে জড়িয়ে দেবার দিশে ধরাতে চেয়েছেন। ইতিহাসের বধিরতা তাতে সাড়া যখন দিলে না—তখন, সেই ভাঙাজীবনের তটসীমা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোতে চেয়েছেন সন্তর্পণ একাগ্রতায় আপন জীবন-কল্পনার স্রোতঃপথে। সেখানে স্রষ্টার আসনটি তাঁর অবিচল। যা আছে, তার ছবি আঁকাই একমাত্র কাজ নয় তাঁর,—যা খোয়া গেল তাকে পেরিয়ে, উত্তরণের নিশানাটির নিত্য সন্ধানী তিনি। সে নিশানা কেবল "চতুরঙ্গ"র শচীশেরই সাধনের ধন নয়, "চার অধ্যায়"-এর অন্ত-এলার মর্মান্তিক জীবন-পরিণামেরও সেই অকুণ্ঠিত জিজ্ঞাসা :—

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা, সে কী ধরার ধুলায় হবে হারা?"—সেইখানেই তো সকল ট্রাজেডির 'ক্যাথারসিস্'-এর উৎস!

অতএব, রবীন্দ্র-উপন্যাসের নান্দনিক মূল্যই একমাত্র নয়, জীবনমূল্য তার চেয়ে গূঢ়তর অর্থবহ।

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তিনাম

[*চিহ্নিত পৃষ্ঠায় কেবল পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

অজিতকুমার চক্রবর্তী *৩১
'অপূর্ব [কুমার] চন্দ ৮৩
অবনীন্দ্রনাথ [ঠাকুর] *৪৬
আইনস্টাইন, এলবার্ট [Einstein Albert] ১০
[ঈশ্বরচন্দ্র] বিদ্যাসাগর ১৩, ৩১
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ৫৯
কেশবচন্দ্র সেন ৪৩, ৪৪, ৪৮
কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১৭, ২৪
গিরিশচন্দ্র [ঘোষ] ১০
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০
জগদীশচন্দ্র বসু ২৮
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ২১
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [ঠাকুর] ৬৯
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৪
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩
ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী ২৯
দামোদর মুখোপাধ্যায় ২১
দীনবন্ধু [মিত্র] ২৮, ২৯
দীনেশচন্দ্র সেন ৯
'প্রিন্স' দ্বারকানাথ [ঠাকুর] ৭৫
দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত *২৪
নগেন্দ্রনাথ [ঠাকুর] ২৯
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ৪০
নিবেদিতা [ভগিনী] *৪৭, ৫৩
পিয়ার্সন, উইলি ৫৩
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ১৭
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২২, *২৪, *৩৭, *৪৫, *৪৬, *৮৮
প্রমথ চৌধুরী *৪৬, ৬৫
প্রমথনাথ বিশী ৫৭, ৬৩, ৮৩
প্রশান্তকুমার পাল *১৭
প্রিয়নাথ সেন ২৮
বঙ্কিমচন্দ্র [চট্টোপাধ্যায়] ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৯, ২৬-২৯, ৩১, ৩৮, ৪৮, ৫৯
বনফুল [বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়] ৫৩
বিজিতকুমার দত্ত *৫৭
বিপিনচন্দ্র পাল ৬০
বিবেকানন্দ, [স্বামী] ৪৭, ৮৯
বিহারীলাল গুপ্ত ৪৪
বুদ্ধদেব বসু ৫৭, ৮৪
ব্রজসুন্দর মিত্র ১৭
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় *৪৭, ৮৭
মতিলাল শীল ৭৪
মদুসূদন [দত্ত] ১৩, ১৬, ২৯, ৪৩
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ [ঠাকুর] ২৩, ৩৪, ৪৫, ৪৬, ৭৪
মাধুরীলতা [রবীন্দ্রকন্যা] ২৩, ৪১
মৃণালিনী দেবী ৩৭, ৪১, ৪২
যিশুখ্রিস্ট ৪৩
রমেশচন্দ্র দত্ত ৪৪
রমেশচন্দ্র মজুমদার *১৮ *১৯, *২৮, *৪৪, *৪৫
রানী চন্দ *৪৬, ৭৯
রামতনু লাহিড়ী ৫৯
রামদুলাল সরকার ৭৪
রামমোহন [রায়] ১৩, ৩১
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৪২
রামেন্দ্রসুন্দর [ত্রিবেদী] ৪৫

রিচার্ডসন, [স্যামুএল] ১৩
রেণুকা [রবীন্দ্রকন্যা] ৩৭
শরৎচন্দ্র [চট্টোপাধ্যায়] ৪১, ৭৭, ৮৩
শিবনাথ শাস্ত্রী ৬০
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭
শ্রীরামকৃষ্ণ ১০
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৪
সুকুমার সেন *৪৮
সুনীতি [কুমার চট্টোপাধ্যায়] চাটুজ্জে ৮০, ৮১
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪, ৬০
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ২৭
স্বর্ণকুমারী দেবী ২৯
হার্বার্ট স্পেন্সার ৬২
হ্যাডলক এলিস ২৭
Fox, Ralph *২১, *২৬, *৩৭, *৪২
Wise, James [ডাক্তার ওয়াইজ] *১৭

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থনাম

[*চিহ্নিত পৃষ্ঠায় কেবল পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

অনুশীলন তত্ত্ব ৫৯
আত্মশক্তি *৪৬, ৪৮
আধুনিক সাহিত্য *৪৮
আনন্দমঠ ৮৯
আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ *৭৯
অ্যাগামেমনন ৪৩
ইন্দিরা ১৪, ৪১
ইলিআড ২১, ৪৩
উত্তর রামচরিত ৪৩
একাল ও সেকাল *—
একেই কি বলে সভ্যতা ১৪, ২৯
কপালকুণ্ডলা ২১, ৩৮
কবিকাহিনী *১৮
করুণা ১১-১৪, ১৬, ২৫, ২৯, ৩১, ৪৯
কল্লোল ৪০, ৬১, ৭৩, ৮৩, ৯১
কালান্তর *৫৬
কৃষ্ণকান্তের উইল ১৩, ১৪, ১৬, ২৭, ৩১, ৩২, ৪৩
কৃষ্ণচরিত্র ৪৮
গল্পগুচ্ছ *৪৯
গৃহদাহ ৪১
গোরা ১২, ৩৭, ৪১-৫৪, ৫৬, ৬০, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭৩, ৮৩, ৯২
ঘরেবাইরে ১২, ৬৬-৬৮, ৭০-৭৩, ৮৭
ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য *৯
ঘরোয়া *৪৬
চতুরঙ্গ ১১, ১২, ৩৫, ৫১, ৫৪-৬৬, ৭২, ৭৩, ৮১, ৮৩, ৯২
চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ১৭
চন্দ্রশেখর ১০, ১৩, ১৪, ২৬
চারঅধ্যায় ১১, ১২, ৭৯, ৮৬-৯২
চারইয়ারি কথা ৬৫
চারুপাঠ ২৮
চিঠিপত্র *২৮, ৮৫
চিত্রা ৩৬
চোখের বালি ১২, ১৫, ২০, ২৬-৩৮, ৪৩, ৪৯, ৬৩, ৭০, ৭৩, ৮৩
ছবি ও গান ২৩
ছিন্নপত্র *১৪
জীবনস্মৃতি ৩০, ৮৮
তিনপুরুষ ৭৫, ৭৮
তিনসঙ্গী ৬৩
দুই বোন ১২, ৭৯, ৮৪-৮৬, ৯১
দুর্গেশনন্দিনী ১১, ২১
দেবীচৌধুরাণী ২৮, ২৯, ৫৯
ধর্মতত্ত্ব ৫৯
ধাত্রীদেবতা ৭৩
নবজীবন ৪৬
নবাবনন্দিনী আয়েষা ২১
নীলদর্পণ ৯
নৈবেদ্য *৬১
নৌকাডুবি ১২, ৩৬-৩৮, ৪০-৪২, ৪৯, ৬৩
পরিশেষ *৮৯
পামেলা ১৩
প্রকৃতির প্রতিশোধ ২৩
প্রচার ৫৬
প্রবাসী ১২, ৪২, *৪৭, *৫৪, ৮০
বউঠাকুরানীর হাট ১২, ১৬-১৮, ২০-২২, ২৪, ২৫
বঙ্গদর্শন ১২, ১৩, ২৮, ৩৬, ৩৭, ৪২
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা *৫৭
বঙ্গাধিপ পরাজয় — ১৭, *১৯
বনফুল ১৬
বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস *৪৮
বালক ১২, ২১, ২৩, *২৪
বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক *৫৭

বাংলাদেশের ইতিহাস *১৮ *২৮ *৪৪
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা *১৬, *৩১
বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার *২১, *৫১, *৬১
বিচিত্রা ১২, ৭৩, ৭৫, ৮০, ৮৪
বিষবৃক্ষ ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ২৮, ৩১, ৩৭, ৪৩
বিসর্জন ২৬
ভগ্নহৃদয় ২৪
ভগবদ্‌গীতা ৭১, ৮৯
ভারতবর্ষ *৪৯
ভারতী ১২, ১৩, ১৭
মনসামঙ্গল ২০
মহাভারত ৫৩
মানসী *৩০, ৪১
মানুষের ধর্ম *৫৭
মালঞ্চ ১২, ৭৯, ৮৪-৮৬, ৯১
মুকুট ২২
মৃন্ময়ী ২১
যোগাযোগ ১২, ৬৭, ৭৩-৭৬, ৭৮-৮০, ৮২, ৮৩
রজনী ১৩
রবিজীবনী *১৭
রবিরশ্মি *১০
রবীন্দ্রজীবনী *২৪, *৪৫, *৮৮
রবীন্দ্রনাথ *৩০
রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য *৫৭
রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা *২৪
রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী *২২, *৩৭
রবীন্দ্রস্মৃতি *৫৩
রাজর্ষি ১২, ২১-২৫, ২৭, ৪৩
রামায়ণ ৪৩
লিপিকা ৮৫
শেষের কবিতা ১২, ৩৫, ৬৩, ৬৪, ৬৭, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮২-৮৬, ৯২
শ্যামলী ১০
সধবার একাদশী ৯, ১৪, ২৯
সন্ধ্যাসংগীত ১৬-১৮, ২০
সবুজপত্র ১২, ৫৪, ৫৬, ৬৫, ৬৬
সমূহ *৪৫, *৪৮
সাহিত্য *১৯
সুরধুনী কাব্য ২৯
সোনারতরী *৩০
স্বদেশ *৬২
স্বর্ণলতা ৪২
স্বদেশী সমাজ —
স্মরণ —
হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ৭৩
Journal of Asiatic Society of Bengal *১৭
Novel And The People (The) *২১, *২৬, *৩৭, *৪২
Religion of Man ১০
Visva Bharati Quarterly *৫৩

Indian Institute of Advance Study
ACC NO. 113484
23.3.04
SHIMLA

Library IIAS, Shimla
B 891.443 2 T 326 C
00113484